গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ১ সংখ্যা ২৯ জুলাই - ৪ আগস্ট, ২০১১ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

ঘুষকে আইনসিদ্ধ করার জন্য শিল্পকর্তার সওয়াল

‘দুর্নীতি মোকাবিলার অন্যতম অস্ত্র হিসাবেই ঘুষ দেওয়াকে আইনসঙ্গত করার জন্য সওয়াল করলেন ইনফোসিস কর্ণধার নারায়ণমূর্ত্তি’। কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের মুখ্য উপদেষ্টা কৌশিক বসু ঠিক এই কথাটি প্রথম স্পষ্ট আকারে তুলেছিলেন। আকারে ইঙ্গিতে কিছু দিন যাবৎ নানা মহলে অবশ্য প্রসঙ্গটা ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে এরা এগিয়ে এলেন সম্ভবত এক নতুন দুনিয়ার দিশারী হতে!

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ঘুষ-দুর্নীতি নিয়ে একেবারে জেরবার। সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষায় পাকানো, বিশ্বব্যাঙ্কের দক্ষতাসম্পন্ন মনমোহনজিকে আচমকা ভারতের কর্ণধার করে বসিয়ে এদেশের শাসকশ্রেণী একটা পরিচ্ছন্ন প্রশাসন উপহার দিচ্ছে — এমনটাই হাজির করা হয়েছিল দেশবাসীর সামনে। সেই মনমোহন সিং সরকারের পরিচ্ছন্নতার মিথ্যা আবরণ খসে পড়ে আজ একটা বিকট রূপ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। দুর্নীতির দায়ে মাত্র দুবছরে যতজন মন্ত্রীকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে সরকার, তার নজির বুর্জোয়া জগতেও খুব কম পাওয়া যাবে। কয়েকজনের তো জেল আটকানো সম্ভব হয়নি। এমনতর অবস্থায় খোদ অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়-এর সাথে রিলায়েন্স-এর আম্বানি গোষ্ঠীর তলে তলে লেনদেনের অভিযোগ প্রকাশ্যে এসে পড়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব নিরীক্ষক আইনি সংস্থা ‘ক্যাগ’-এর রিপোর্টে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরমের নিজস্ব বেসরকারি সংস্থা ‘বেদান্ত’-এর নামে প্রায় বিনামূল্যে হাজার হাজার একর সরকারি জমি কুক্ষিগত করার অভিযোগ আজ সর্বজনবিদিত। নানা অভিযোগের সদুত্তর দিতে না পেরে প্রধানমন্ত্রী তাঁরই মন্ত্রীসভার একের পর এক মন্ত্রীকে সরিয়ে অপর কাউকে বসাচ্ছেন। কিন্তু এতো ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হওয়ার অবস্থা। স্বচ্ছতার ধ্বজাধারী এই সরকার ২০০৮ সালে আস্থা ভোটের দিনই কোটি কোটি টাকায় সাংসদ কেনার অভিযোগে প্রত্যক্ষভাবে অভিযুক্ত হয়েছিল। দুনিয়ার সমস্ত সংবাদমাধ্যমে সেদিন বিশ্ববাসী দেখেছে তথাকথিত সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের খোদ পার্লামেন্টের টেবিলে কয়েক কোটি টাকা ঢেলে দিয়েছেন কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্যই। অভিযোগ মনমোহন সরকারকে টেকানোর জন্য ভোট কিনতে তাঁদের ঘুষ হিসাবে দেওয়া হয়েছিল ঐ টাকা! এ দেশে হাওলা, গাওলা, ট্রেজারি কোনও কেলেঙ্কারিরই ‘বিচার’ মেলেনি। মেলেনি বোফর্স কামান কেনা নিয়ে অপর এক প্রধানমন্ত্রী রাজীবজির ঘুষ কাণ্ডেরও। চলমান কেলেঙ্কারি জোয়ারেরও কোনও বিচার হবে না — এটা হলফ করে বলা যায়। এ সত্য জানা সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতারা খেপে গেছেন। যেমন তহলকা সহ অন্যান্য কেলেঙ্কারিতে সরাসরি ঘুষ কাণ্ড প্রকাশ্যে এসে যাওয়ায় বিজেপি খেপে গিয়েছিল। সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ সরলা মাহেশ্বরীর কেলেঙ্কারি প্রকাশ হওয়ায় সিপিএম নেতারাও চটে লাল হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সকলেই এক সুরে বাঁধা। নেতারা সুবিধামতো বলে থাকেন, ‘আইন আইনের পথেই চলবে’ অসুবিধায় পড়লে উল্টো কথা বলেন। শুধু এটুকুই নয়। যে কংগ্রেস তহলকা কেলেঙ্কারির বেলায় চিৎকার করে বিজেপির বিরুদ্ধে পার্লামেন্ট কাঁপিয়েছিল, এখন কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত ‘ক্যাগ’ যখন খোদ কংগ্রেস অর্থমন্ত্রীর দুর্নীতি ধরে ফেলল তখন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ক্যাগের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে একদিকে চোরাগলির পথ ধরলেন, অপর দিকে সরকারি অর্থদপ্তরের মুখ্য উপদেষ্টা কৌশিক বসুকে দিয়ে ঘুষকে ‘আইনসিদ্ধ’ করার দাবি তুলে দিলেন।

ঘুষ বা উৎকোচ প্রথা বহু দিন ধরেই চলছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ, শুভবুদ্ধির মানুষ একে ঘৃণা করে। সরকারি দপ্তরে ফাইলপত্র খুঁজে পেতে টেবিলের তলায় বামহাতের কারবার হিসাবে এই কুপ্রথাটি এতদিন চিহ্নিত এবং নিন্দিত হয়ে এসেছে। সেটাকেই এখন টেবিলের উপরে ও ডান হাতের কারবার হিসাবে আইনি স্ট্যাম্প দিতে উঠে পড়ে লাগা। তথাকথিত অর্থনীতি বিশারদ কৌশিক বসু অথবা শিল্পপতি

দুয়ের পাতায় দেখুন

খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের প্রতিবাদ জানাল কেন্দ্রীয় কমিটি

ভারতের খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের দরজা খুলে দিতে কেন্দ্রীয় ইউ পি এ সরকারের সাম্প্রতিক তৎপরতার তীব্র প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই (সি) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৫ জুলাই এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন,

“দেশি ও বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার ভারতের খুচরো ব্যবসা ক্ষেত্রকে বিদেশি মাল্টিন্যাশনাল একচেটিয়া কোম্পানিগুলির বিনিয়োগের জন্য খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর দ্বারা ‘ভারতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হবে, ফসল ও পণ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাদি বৃদ্ধি পাবে, সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন হয়ে ভোক্তাদের সাহায্য হবে’ ইত্যাদি যেসব অজুহাত সরকার দিচ্ছে, সেগুলি আদৌ সত্য নয়।

বস্তুত, কেন্দ্রীয় সরকারের এই অশুভ পদক্ষেপ খুচরো ব্যবসায় লিপ্ত কয়েক কোটি মানুষকে জীবিকাচ্যুত করে পথের ভিখারিতে পরিণত করবে। অন্য দিকে ভারতের খুচরো ব্যবসা ক্ষেত্রে বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির একাধিপত্য কায়েমের দ্বারা তাদের বিপুল মুনাফা লুণ্ঠনের সুযোগ করে দেবে।

আমরা ইউ পি এ সরকারের এই জঘন্য পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করছি। শুধু খুচরো ব্যবসায়ীরাই নয়, দেশের সকল গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষকে আমরা শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন জানাচ্ছি যাতে এই সর্বনাশা নীতি প্রত্যাহারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করা যায়।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস

৫ই আগস্ট

সমাবেশ

রানি রাসমণি অ্যাভেনিউ, বিকাল-৪টা

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ, সভাপতি ঃ কমরেড সৌমেন বসু

উদ্ধৃতি প্রদর্শনী

৪-৫ আগস্ট

এসপ্ল্যানেড মেট্রো চ্যানেল

উদ্বোধক ঃ কমরেড শঙ্কর সাহা

বিশাল সমাবেশ থেকে গঠিত হল ‘পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন’

২২ জুলাই। কলকাতার ভারতসভা হলে ‘আশা’ কর্মীদের কনভেনশন। বক্তব্য রাখছেন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। সমাবেশে আশা কর্মীদের ন্যূনতম ৬,৬০০ টাকা বেতন, বোনাস, পিএফ, পেনশনের ব্যবস্থা, উন্নত ট্রেনিং, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সাবসেন্টারগুলিতে প্রসূতি মায়েদের প্রসবের সুব্যবস্থা প্রভৃতি দাবি তুলে ধরা হয়। কনভেনশন থেকে বিমল জানাকে সভাপতি ও কৃষ্ণা প্রধানকে সম্পাদিকা করে ২৭ জনের শক্তিশালী রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন মিনতি মণ্ডল, কল্পনা শতপথী, শীলা চক্রবর্তী, ডালিয়া দত্ত, হামিদা গাজি, বানাতুন্নাস সহ অন্যান্য আশা কর্মীরা।

পুর বাজারগুলির সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে কলকাতা মেয়রকে ডেপুটেশন দিল এস ইউ সি আই (সি)

১৩ জুলাই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কলকাতা জেলা কমিটির এক প্রতিনিধি দল কলকাতা পুরসভার মেয়রের সাথে সাক্ষাৎ করে কলকাতার তিনটি মার্কেটের সমস্যা সমাধানের দাবি জানান। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস শিলাজিৎ সান্যাল ও শিবাজি দে। প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন নারায়ণ রবিদাস, জুবের রব্বানি, আয়সানুল হক এবং এম এ রওশন। তাঁরা মহানাগরিককে স্মরণ করিয়ে দেন যে, নন্দরাম মার্কেটে ২০০৮ সালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পরে তৎকালীন সিপিএম সরকার ও পুরসভা বৃহৎ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলির স্বার্থে মার্কেট ভেঙে শপিং প্লাজা তৈরি করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবনজীবিকা চিরতরে শেষ করতে চেয়েছিল। এর বিরুদ্ধে নন্দরাম মার্কেট বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে প্রায় দু'বছর ধরে ব্যবসায়ীরা আন্দোলনে সামিল হন। যার ফলে সিপিএম মার্কেট ভাঙতে পারেনি। টিএমসি এবং এস ইউ সি আই (সি) যৌথভাবে ব্যবসায়ীদের আন্দোলনের সাথে থেকে সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সেসময় ব্যবসায়ীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এসেই সমস্যার সমাধান করা হবে। এক বছরের বেশি সময় টিএমসি পুরসভায় ক্ষমতায় আসীন। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য, নন্দরাম মার্কেটের সমস্যা সমাধানের কোনও উপযুক্ত পদক্ষেপ এখনও গ্রহণ করা হয়নি। প্রতিনিধিরা আশা প্রকাশ করেন, মহানাগরিক দ্রুততার সাথে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং সমস্ত ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের ব্যবসায়ীদের সাথে কোনও প্রকার লিখিত চুক্তি না করে পূর্বতন সিপিএম পরিচালিত পুরসভা গায়ের জোরে সমস্ত দোকানদারদের মার্কাস স্কোয়ারে অস্থায়ী দোকানে যেতে বাধ্য করে। পুনর্বাসনের সময়সীমা ১৮ মাস পেরিয়ে ৫৫ মাস অতিক্রান্ত হলেও মার্কেট তৈরির কাজ অসমাপ্ত। প্রতিনিধিরা দাবি করেন, ১৮ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর থেকে প্রতিটি দোকানদারকে মাসভিত্তিক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক, ঠিকাদার সংস্থাকে মার্কেট তৈরির সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হোক। প্রতিটি দোকানদারের পূর্বে যে পরিমাণ জায়গা ছিল নতুন মার্কেটে সেই পরিমাণ জায়গা যেন তারা অবশ্যই পান।

পূর্বতন পুরসভা বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর স্বার্থে পার্কসার্কাস মার্কেট রিলায়েন্স কোম্পানিকে বিক্রি করে দেয়। এর বিরুদ্ধে সংকটগ্রস্ত দোকানদাররা টিএমসি এবং এস ইউ সি আই (সি) দলের সহযোগিতায় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। তার ফলে রিলায়েন্স কোম্পানি মার্কেট দখল করতে পারেনি। রিলায়েন্সের সাথে পার্কসার্কাস মার্কেট বিক্রি সংক্রান্ত চুক্তি বাতিল, মার্কেটের সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে মার্কেটের ভিতরের দোকানদার এবং বাইরের হকারদের উচ্ছেদ না করার জন্য প্রতিনিধিরা আবেদন জানান।

তাঁরা মেয়রকে জানান, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবী ও বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রয়াত ডাঃ কে পি ঘোষ দীর্ঘকাল ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের জনপ্রিয় নির্বাচিত পৌরপ্রতিনিধি ছিলেন। এলাকার প্রায় প্রতিটি সাধারণ মানুষের সাথে আমাদের দলেরও দাবি প্রয়াত ডাঃ কে পি ঘোষের বাড়ির রাস্তাটির নাম 'ছকু খানসামা লেনের পরিবর্তে ডাঃ কে পি ঘোষ সরণি করা হোক, যা পূর্বে সিপিএম পরিচালিত পুরসভা করতে রাজি হয়নি।

আলোচনা প্রসঙ্গে মহানাগরিক এস ইউ সি আই (সি) এবং টিএমসি-র যৌথ আন্দোলনের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, তাঁরা পার্কসার্কাস মার্কেট সংক্রান্ত রিলায়েন্সের সঙ্গে পুরসভার চুক্তি বাতিল করবেন এবং কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের দোকানদারদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন। নন্দরাম মার্কেট সংক্রান্ত আইনি জটিলতা কাটিয়ে তিনি দ্রুত মার্কেট সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। প্রতিনিধিদের দাবি অনুযায়ী তিনি ১৫ আগস্টের পর নন্দরাম মার্কেটের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনার প্রতিশ্রুতি দেন।

পি টি টি আই সমস্যা সমাধানের দাবিতে কনভেনশন

পি টি টি আই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের দাবিতে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আহ্বানে ১৬ জুলাই কলকাতার ভারত সভা হলে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে পি টি টি আই সমস্যার জন্য পূর্বতন রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিকে দায়ী করা হয়। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকারও সমালোচনা করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগে পি টি টি আই ছাত্রদের জন্য বর্তমান রাজ্য সরকারের ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ঘোষণার সমালোচনা করে বলা হয়, এর ফলে সমস্যা আদৌ মিটবে না। প্রায় ২৪ হাজার পি টি টি আই শিক্ষার্থীর চাকরি সুনিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে সরকারি ঘোষণার দাবি জানানো হয়। পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং তাঁদের পূর্ণ বেতনের শিক্ষকপদে উন্নীত করার দাবিও জানানো হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা বলেন, এক মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে সমিতি বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সভাপতি অজিত হোড়, তপতী মিত্র, আনন্দ হাণ্ডা, কনক সরদার প্রমুখ।

ঝাড়খণ্ডে বস্তি বাঁচাও আন্দোলন

রাঁচিতে বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ১৬ জুলাই মৌসিবাদী, জগন্নাথপুর, নিউ কলোনি, আদর্শনগর, গায়ত্রীনগর, সাংদারগড় প্রভৃতি বস্তির কয়েক হাজার বাসিন্দার এইচ ই সি সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ

অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ

রাজ্যে পূর্বতন সিপিএম সরকারের প্রাথমিকে পাশফেল তুলে দেওয়ার সর্বনাশা নীতি, প্রাথমিক শিক্ষার ভিত ধ্বংস করে দিয়েছে। কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার শিক্ষার অধিকার আইনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। পূর্বতন রাজ্য সরকার এই আইনের সঙ্গে সহমত হয়ে তা কার্যকর করার দিকে এগোচ্ছিল। এ রাজ্যের আপামর শিক্ষানুরাগী মানুষ আশা করেছিলেন, নতুন সরকার এই শিক্ষাসংহারকারী নীতির বদল ঘটাবে। কিন্তু গত ১১ জুলাই স্কুল শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ঘোষণা সকলকে উদ্বিগ্ন করেছে। তিনি বলেছেন, তাঁরা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দিতে চান।

এর বিরুদ্ধে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে কলকাতায় ১৩ জুলাই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় উল্টাডাঙা, ভিআইপি মোড়, যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ডে এবং বেহালা চৌরাস্তায়। এই সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন কমিটির কলকাতা জেলা সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তী, মাধ্যমিক শিক্ষক নেতা বিশ্বজিৎ মিত্র, অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে আশিস বসু, বনশ্রী চক্রবর্তী, অমিয় জানা, সুব্রত বাগচী, শর্মিষ্ঠা চৌধুরী, প্রণতি মণ্ডল, উল্টাডাঙা কমিটির সভাপতি অনিল ঘোষ, শহিদ স্মরণ কমিটির সম্পাদক তপন সিনহা যাদবপুর কমিটির সম্পাদক অপূর্ব সেনাপতি প্রমুখ।

রাজ্যব্যাপী ছাত্রবিক্ষোভ

এ আই ডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই জানিয়েছেন, ১৩ জুলাই সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অংশুমান রায়-এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি প্রদান করেন। তাছাড়া ১২ জুলাই থেকে সপ্তাহব্যাপী রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই দু'দিনে রাজ্যের কলকাতা, মেদিনীপুর (পূর্ব), মেদিনীপুর (পশ্চিম) , বাঁকুড়া, বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, শিলিগুড়ি, পুরুলিয়া সহ বিভিন্ন জেলায় ডিআই অফিসে ডেপুটেশন বিক্ষোভ এবং স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। ডিএসও বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে শতাধিক ছাত্রছাত্রী রামপুরহাটে রাস্তা অবরোধ করে সরকারের কালা সার্কুলারের প্রতিলিপি পোড়ায়। যূথিকা ধীবর ও ভরত রবিদাস শিক্ষা সংহারকারী নীতির উপর বক্তব্য রাখেন।

১৪ জুলাই মুরারইতে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে ১৬ জুলাই ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনে শিক্ষামন্ত্রীর উপরোক্ত ঘোষণার প্রতিবাদে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঘুষকে আইনসিদ্ধ করার জন্য সওয়াল

একের পাতার পর

নারায়ণমূর্ত্তি মহোদয়দের বক্তব্য হল 'ঘুষ নেওয়া নয়, ঘুষ দেওয়াকে আইনি ঘোষণা করা হলেই একমাত্র আটকানো যাবে দুর্নীতির কাঁটা। কারণ এতে ঘুষ প্রদানকারীর ভয় আটকাবে। ফলে, পরবর্তীকালে ওই ব্যক্তিই দুর্নীতিগ্রস্ত ঘুষ গ্রহীতাকে চিনিয়ে দেওয়ার কাজে সাহায্য করতে পারবে।' বর্তমানে যেসব দুর্নীতি বা কেলেঙ্কারির ঘটনা ধরা পড়েছে, তাতে মন্ত্রী-আমলা ও বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠীগুলি যুক্ত। এসব ক্ষেত্রে ঘুষ দিচ্ছেন পুঁজিপতিরা, সেই ঘুষ নিয়ে তাদের বিশেষ সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মন্ত্রী ও আমলারা। এ ক্ষেত্রে কোনও এক পুঁজিপতি গোষ্ঠী বেআইনি পথে যে লাইসেন্স বা অন্য সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, তারা ঘুষ দেয় যাতে অন্য কোনও পুঁজিপতি গোষ্ঠী তা হাতিয়ে নিতে না পারে। এ ক্ষেত্রে 'ঘুষ দেওয়া' আইনি হলে, তা কীভাবে দুর্নীতি দূর করতে পারে? ঘুষ দাতারাই বা কেন ঘুষ গ্রহীতাকে চিনিয়ে দেবেন? ঘুষ যখন বেআইনি সুবিধা এনে দিচ্ছে তখন ঘুষ দাতারা মুর্খের মতো ঘুষ দাতাকে চিনিয়ে দেবে — এ যুক্তি অবিশ্বাস্য। এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না যে এমন আইন থাকলে টাটারা প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী এ রাজাকে ধরিয়ে দিত। আসলে টাটা-রিলায়েন্স প্রভৃতি কর্পোরেট সংস্থাগুলির ঘুষকাণ্ড যেভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ছে তাতে রাষ্ট্র তাদের আড়াল করতে যথাসাধ্য করলেও দেশের মানুষের কাছে তাদের আসল চেহারা ধরা পড়ে যাচ্ছে। এ সব থেকে মুখ রক্ষা করতেই ইনফোসিস কর্তা নতুন ফর্মুলা নিয়ে হাজির হয়েছেন। ভয়ও নিশ্চয় আছে। শুধু টাটা-আম্বানিরাই তো নয়, আউটসোর্সিং-এর বরাত পেতে ইনফোসিস কর্তারাও যেভাবে বিভিন্ন দেশের নানা প্রভাবশালী লবিকে হাত করার জন্য কোটি কোটি ডলার ঢালেন, এ দেশেও হয়ত কোনও মন্ত্রী বা আমলার পকেটে তেমনই ঢেলে বসে আছেন, যা যে কোনও সময় প্রকাশ হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আসলে কর্পোরেট পুঁজি আর দুর্নীতি আজ সমার্থক। পুঁজিবাদ আজ দুর্নীতি ছাড়া বাঁচতে পারে না।

আসলে এদের 'যুক্তি'র মর্মার্থ হল, সব আগল খুলে দাও, গোপনীয়তা রেখো না, প্রকাশ্যেই ঘুষ দেওয়াকে আইনি করে দাও, তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়। ঘুষ দুর্নীতির পক্ষে এমন খোলাখুলি সওয়াল, ইতিপূর্বে আমাদের দেশেও কেউ করেছেন কি না, জানা নেই, তবে একদল সমাজতাত্ত্বিক কিছু কাল বলে চলেছেন — যৌনতাকে উন্মুক্ত করে দাও তাহলে সমাজে নোংরামি ও অপরাধ প্রবণতা কমবে। এই যুক্তিতে মার্কিন আদলে আমাদের দেশে স্কুল শিক্ষায় যৌনতা পড়ানোর পক্ষে সওয়াল করছেন তথাকথিত নেতামন্ত্রীরা। নষ্টামির পথে হাঁটতে হাঁটতে এরা একেবারে নরকের দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছে আজ। এর পরে কবে বলবে খুন, ধর্ষণকেও আইনসিদ্ধ করে দিলে এই প্রবণতা সমাজে কমানো যাবে। কর্পোরেট পুঁজির মালিকদের মুখে এসব বক্তব্যই মানায়, কারণ, এদের কাজকারবারের ভিত্তিই হল চুরি-দুর্নীতি। এরা লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে পরিকল্পনা মাফিক মেরে দেয়। দেশের আইন তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করে না। এরা কর্মচারী হিসাবে যাদের দিয়ে কাজ করায় তাদের বাইরের চাকচিক্যটা 'ঘুষ' দেয়, আর ভেতরের রক্তটা শুষে নিয়ে ছিবড়ে করে ফেলে দেয়। সরকারি ছত্রছায়ায় এ

ই বিপুল পরিমাণ টাকা ঘুষ দুর্নীতিতে লুঠ হচ্ছে, এসব কার টাকা? আপামর জনসাধারণের শ্রমে সৃষ্টি এই সম্পদ লুটে নিচ্ছে একদল মুনাফাবাজ। শ্রমশক্তির আইনি ও বেআইনি লুণ্ঠনের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। সেই লুণ্ঠনকে আড়াল করতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সময় থেকেই সৃষ্টি হয়েছে 'আইন'। শোষণ লুণ্ঠনের নির্মমতাকে আড়াল করতে এসেছে কখনো রাজা জমিদারের 'দানশীলতা' তেমনি বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের চরিত্রকে আড়াল করতে আনা হয়েছে মধুমাখা বুলি — গণতন্ত্র। আর এই গণতন্ত্রের পরিকাঠামোতে পরিচ্ছন্নতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে এসেছে 'দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসনের' বাগাড়ম্বর। আজ সংকট জর্জরিত সেই ধনতন্ত্রের 'গণতান্ত্রিক', 'পরিচ্ছন্নতা'র খোলসটা খুলে দিয়ে তারা নিজেরাই ঘোষণা করছে পরিচ্ছন্ন প্রশাসন আসলে সোনার পাথর বাটি। এটা আসলে দুর্নীতি-রাজ। দুর্নীতির এমন খোলাখুলি প্রকাশে শাসনব্যবস্থার ভেতরকার কদর্য চেহারাটা জনগণের চোখের সামনে ধরা পড়ে গেছে এবং স্বভাবতই এ সব 'দেশপ্রেমিক' শিল্পপতি ও নেতা-মন্ত্রীদের গাঁটছড়া ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমনে পুঞ্জীভূত প্রবল ক্ষোভ আন্দোলনের রূপে ফেটে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। সম্ভবত এ জন্যই ইনফোসিস কর্তা ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টাকে হালকা করে দিয়ে জনবিক্ষোভে জল ঢেলে দিতে চেয়েছেন।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কমরেড রণজিৎ ধর

৭-৯ জুলাই ফিলিপিন্স-এর ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল লীগ অফ পিপলস স্ট্রাগলের চতুর্থ সম্মেলনে যোগ দিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর নিম্নলিখিত বক্তব্য রাখেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এবং শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর সাম্রাজ্যবাদীরা উৎফুল্ল হয়ে ঘোষণা করে যে, সারা পৃথিবী এখন একমেরু বিশ্বে পরিণত হয়েছে, বিশ্বে যুদ্ধের প্রধান হোতা এবং শান্তির শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়ন আর নেই, বিশ্ববাজার এখন খণ্ডিত নয়, তা একটি বাজারেই পরিণত হয়েছে, যেখানে সকল দেশই বিকাশ ও উন্নয়নের সুযোগ পাবে। একেই তারা বলেছে বিশ্বায়ন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের ঘটনায় বিভ্রান্ত মানুষের মনে যখন বিশ্বায়নের শ্লোগান নানা রঙীন স্বপ্ন সৃষ্টি করছিল, তখনই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় আবার ঘোরতর সঙ্কট ঘনিয়ে আসে। বর্ধিত উৎপাদন ক্ষমতা ও জনগণের ক্রমহ্রাসমান ক্রয়ক্ষমতার ফলে পুঁজিবাদে সঙ্কুচিত বাজারের সঙ্কট অনিবার্য। এই সঙ্কুচিত বিশ্ব বাজার ভাগাভাগির জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হয়েছে। অর্থনৈতিক এবং মিলিটারি শক্তির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের নেতা থাকলেও শিবিরের মধ্যে থেকেই তার আধিপত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপান বর্তমানে বিশ্ববাজারে অপ্রতিরোধ্য প্রতিযোগী হিসাবে উঠে আসছে। ভারতীয় পুঁজিও বহুদিনই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে এবং এই বাজারে এরাও নিজস্ব ভাগ নিতে অত্যন্ত আগ্রহী। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি-'বাড়তি পুঁজি এবং বাজার সঙ্কোচন' এই অমীমাংসেয় সঙ্কটে নিমজ্জিত। এই সঙ্কট পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে রোগের মতো গ্রাস করেছে।

আমাদের বুঝতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যেমন আছে, আবার সহযোগিতাও আছে। এভাবেই তাদের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। কিন্তু, দ্বন্দ্ব থাকার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দেশগুলির নিজেদের মধ্যে ঐক্য শক্তিশালী বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি বিরোধিতার উদ্দেশ্যে এদের ঐক্য তৈরি হয়, কিন্তু দ্বন্দ্ব অনিরসনীয় থেকে যায়। দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্যে অবস্থিত এই জটিল সম্পর্কের মধ্যেই যুদ্ধের বীজ নিহিত থাকে।

নিজের অর্থনৈতিক সঙ্কট মেটাতে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের চূড়ামণি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যতটা পারে অন্য দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক স্তরে প্রভাব বিস্তার ঘটায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশের সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে কোনও আন্তর্জাতিক আইনের পরোয়া করে না এবং যে দেশগুলি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে তার বিপদ হিসাবে দেখা দিতে পারে, তাদের ধ্বংস করার অধিকার সে নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে, তার নিজের প্রয়োজনে। এটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেও বুশ সরকার দ্বিধা করেনি। এই কথাটা ইরাক, আফগানিস্তান, যুগোশ্লাভিয়ায় নৃশংস আক্রমণ, ইরান, সিরিয়া, লিবিয়া, উত্তর কোরিয়া এবং কিউবায় প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক অবরোধ এবং যুদ্ধের হুমকির মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

ফিলিপিন্স

মার্কিন আগ্রাসন এবং জনসাধারণের মুক্তির জন্য আকাঙ্খার মধ্যে বর্তমানে লড়াইয়ের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে পশ্চিম এশিয়া। ৯/১১'র ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' একটা অজুহাত দিয়েছে এবং আফগানিস্তান ও ইরাকের বিরুদ্ধে তারা জঘন্য যুদ্ধে নেমেছে। মধ্য এশিয়ার বিরাট তৈল ভাণ্ডারের দিকে চোখ রেখেই তারা আফগানিস্তানে যে যুদ্ধে নেমেছে, একথা পরিষ্কার। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কিরঘিজিস্তান এবং তাজিকিস্তানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়েছে। বুশের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র ক্ষোভকে হাতিয়ার করেই বারাক ওবামা ক্ষমতায় আসেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ওবামা প্রথমেই আফগানিস্থানে আরও সেনা পাঠান। কিন্তু দফায় দফায় সেনা পাঠিয়ে আমেরিকা আরও সঙ্কটে ডুবেছে এবং এখন মুখ রক্ষা করে পিছানোর রাস্তা খুঁজছে। আফগানিস্তানে রাশিয়া যখন হঠকারি সিদ্ধান্তে সেনা পাঠায় তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মৌলবাদী শক্তিগুলিকে মদত যুগিয়েছে আমেরিকা। পরবর্তীকালে এই মৌলবাদী শক্তিগুলিই ফ্র্যাঙ্কেইস্টাইন হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও কার্যকলাপ আফগানিস্তানকে গৃহযুদ্ধের মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর লড়াইয়ে কখনও এদের কখনও ওদেরকে সমর্থন করে আমেরিকা যুদ্ধের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। এই প্রক্রিয়ায় দেশটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আফগান জনতা ন্যাটো বাহিনীর আক্রমণ আর মৌলবাদীদের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের মাঝে পড়ে পিষ্ট হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র আগ্রাসনের প্রত্যক্ষ পরিণামে আফগানিস্তান আজ এক শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে।

ইরাকে সাদ্দাম হোসেন মার্কিন চাপের কাছে মাথা নত করতে না চাওয়ায় একইভাবে সাম্রাজ্যবাদী চক্র ইরাকের তৈল ভাণ্ডার লুঠ করার জন্য সাদ্দামকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে। গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে এই মিথ্যা অজুহাতে ইরাক আক্রমণ করে দখল করা হয়।

আজকের পৃথিবীতে তেলের দখলই আন্তর্জাতিকভাবে ক্ষমতার ভারসাম্য নির্ধারণ করে দেয়। সৌদী আরবের তেল ইতিমধ্যেই মার্কিন দখলে এবং তারা ইরাকের তৈল ক্ষেত্রের দখল যদি একচ্ছত্রভাবে নিতে পারে, তাহলে পশ্চিম এশিয়ার তেলের উপর তাদের দখল আরও শক্তিশালী হবে। তেলের উপর আধিপত্য বিশ্বের উপর মার্কিন. আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে এবং বিশ্বের যে কোনও দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও সে অর্জন করতে পারবে। বর্তমানে ইরাক এবং আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ তার হাতে এসে যাওয়ার পর এক বিশাল তৈল ভাণ্ডারও তার নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে।

ইরাক দখল নেওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে পুতুল সরকার বসিয়ে এবং পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতপাত ভিত্তিক গোষ্ঠীর মধ্যে নৃশংস দাঙ্গা লাগিয়ে তাদের বজ্র আঁটুনিকে আরও শক্ত করতে চাইছে। এত কিছুকে উপেক্ষা করেও ইরাকী প্রতিরোধ সাহসের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং মার্কিন বাহিনীর প্রবল ক্ষতিও করছে। যদিও বিশাল মার্কিন বাহিনীর কিছু অংশ ধাপে ধাপে ইরাক ছেড়ে চলে যাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তবে একথা সত্য যে, মার্কিন স্বার্থকে দেখার জন্য বেশ কিছু মার্কিন বাহিনী সেখানে থেকেও যাবে। ইরাক এবং আফগানিস্তানের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার দিকে নজর ফেলেছে।

আরব দেশগুলিতে যে জাতীয় এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার বইছে, ইহুদিবাদী ইজরায়েল শাসকদের সমর্থন দিয়ে তাকে দমিয়ে রাখাই হলো পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন পরিকল্পনা। পাশাপাশি, আরব দেশগুলির মধ্যে যারা মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করছে, তারা দেশের মানুষের উপর স্বৈরাচারী এবং অত্যন্ত দমনমূলক শাসন চালালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সমর্থন করে যাচ্ছে। এই সমস্ত দেশের জনগণ স্বৈরাচারী শাসনের চাপে ন্যুব্জ শুধু নয় পুঁজিবাদী শোষণ এবং শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট। নির্মম শাসন এবং শোষণ, চূড়ান্ত দারিদ্র, বেকারী, অভাব-অনটনের চাপ এবং পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্খা মানুষকে শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে বাধ্য করেছে। এটা প্রথম শুরু হয় টিউনিশিয়ায়, তার পর দাবানলের মতো উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। যখন মিশর আর টিউনিশিয়ার স্বৈরাচারী শাসক পদত্যাগ করল তখন মানুষ আন্দোলনে প্রথম ধাপে জয়ের স্বাদ পেল। কিন্তু এই ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের এবং তাদের বন্ধু ইজরায়েলকে ভয় ধরিয়ে দিল। তারা দেওয়ালের লিখন পড়তে পারল এবং বুঝল যে, মানুষ যখন একটি সঠিক দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে সামিল হয় তখন তার শক্তি কী অসীম। তাই সাম্রাজ্যবাদীরা এই দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে শুরু করল এবং 'মানবিক' কারণে তারা জনগণের ন্যায়সঙ্গত লড়াইয়ে সাহায্যের ভান করে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল। অন্যদিকে লিবিয়া এবং সিরিয়ায় তারা তাদের চর ঢুকিয়ে বিভিন্ন অসন্তোষ ছড়াতে থাকে। গণতন্ত্রের জন্য লড়াই-এর নামে তারা দালাল ঢুকিয়ে রক্তাক্ত সশস্ত্র কার্যক্রম চালিয়ে সরকারের স্থায়িত্ব নষ্ট করার চক্রান্ত করতে থাকে। কর্ণেল গদ্দাফির বিরোধীদের মানবিক সাহায্য দেওয়ার নাম করে এবং ন্যাটোর নামে তাদের অস্ত্র সাহায্য দিয়ে লিবিয়ার বিরুদ্ধে তারা পুরোদমে আকাশ যুদ্ধ শুরু করে দেশটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, প্রচুর মানুষকেও খুন করছে।

ন্যাটোর বিমান হানা বন্ধের দাবিতে এবং

পাঁচের পাতায় দেখুন

রেল যাত্রায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবহেলিত থেকে যাচ্ছে

রেলযাত্রা কতটা নিরাপদ, প্রতিটি দুর্ঘটনার পর এই প্রশ্ন বারবার ওঠে। কালকা মেলের ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখিও হচ্ছে। সাধারণের অজানা বহু ভয়াবহ তথ্যও উঠে আসছে। তথ্যগুলিকে একত্রিত করলে বোঝা যায় যে, সরকারে যেই আসুক, তারা অন্তত রেলযাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারছে না।

গত ১০ জুলাই হাওড়া-দিল্লি কালকা মেল দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে সরকারি হিসাবে ৬৯ জনের। অসংরক্ষিত দুটি কামরায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। দুটি কামরায় ৭২টি করে সিট থাকলেও প্রায় তিনগুণ লোক ভিড়ে ঠাসাঠাসি করে যাচ্ছিলেন। ঐ কামরা দুটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এঁদের পরিণতি অজানা। দুর্ঘটনায় আহতের সংখ্যা প্রায় শ'তিনেক। কালকা মেলের দুর্ঘটনার দিনই রাত্রে আসামের কামরূপের রঙ্গিয়ায় গুয়াহাটি-পুরী এক্সপ্রেস বিস্ফোরণের কবলে পড়ে। লাইনচ্যুত হয় যাত্রীবোঝাই ট্রেনটির ৭টি বগি। গুরুতর আহত হন শ'দেড়েক যাত্রী। শুধু এই দুটি দুর্ঘটনাই নয়, তারপর দু'দিনে দুর্ঘটনার মুখ থেকে বেঁচে গেছে পাটনা-দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, নয়াদিল্লি-মুজফ্ফরপুর সপ্তক্রান্তি সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস।

সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে গত আড়াই মাসে ৫৭টি রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। সরকারি হিসাবে এই আড়াই মাসে রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১২৭ জন যাত্রীর। শুধু তাই নয়, ২০০৮-'০৯ সালে রেল দুর্ঘটনায় মারা যান ২০৯ জন, আহত হন ৪৪৪ জন। ২০০৯-'১০ সালে যথাক্রমে ২২৫ এবং ৩৩৬ জন, ২০১০ এর এপ্রিল থেকে '১১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩৮ এবং ৪৩৭ জন। দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর এই সংখ্যা বাড়ছে। প্রশ্ন উঠছে, কেন এই অব্যবস্থা। কেন এত সুরক্ষার অভাব? ভারতীয় রেলের কি অর্থের অভাব? তা তো নয়ই, বরং রেল একটি অত্যন্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠান। রেল ২০০৫ সালে ৯০০ কোটি টাকা, ২০০৬ সালে ১৪০০০ কোটি, ২০০৭ সালে ২০,০০০ কোটি, ২০০৭-০৮ সালে ২৫,০০০ কোটি টাকা লাভ করেছে। ফলে অর্থের অভাবের কোনও প্রশ্নই নেই। তাহলে কি গুরুত্বের অভাব? তাও নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এটিই একমাত্র দপ্তর যেটির একটি স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। আলাদা বাজেট আছে। যে বাজেট কেন্দ্রীয় বাজেটের বাইরে আলাদা করে পাশ হয়। তা নিয়ে সংসদে আলাদা করে আলোচনাও হয়।

১৮৫৩ সালে এদেশে প্রথম রেল চালু হয়। ১৬১ বছর ধরে ভারতীয় রেল পৃথিবীর বৃহত্তম রেল ব্যবস্থা। ভারতীয় রেল ১৬টি জোনে বিভক্ত। প্রতিটি জোনই আলাদা করে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে দেখভাল করার কথা। অথচ বর্তমানে এই ১৬ টি জোনের ৭টিতেই জেনারেল ম্যানেজার নেই। রেল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা সবসময় ৭ জন থাকার কথা। কিন্তু বর্তমানে মাত্র তিনজন সদস্য রয়েছেন। একই ব্যক্তির ঘাড়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ন্যূনতম ২টি করে দপ্তর আছে। যেমন বর্তমানে বোর্ডের চেয়ারম্যান একই সাথে রেল ট্রাফিক পরিষেবা বা আই আর টি এস-ও সামলাচ্ছেন। রেলওয়ে ট্রাফিক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। দেশের রেল চলাচলের মূল দায়িত্বে থাকেন মেম্বার ট্রাফিক। অথচ এই পদ খালি পড়ে রয়েছে। বোর্ড চেয়ারম্যান তার দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। তা যে বাস্তবে সম্ভব নয় তা বারবার দুর্ঘটনাই প্রমাণ করে দিচ্ছে। মেকানিকাল এবং ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরির দায়িত্বে রয়েছেন একজনই। মধ্য জোন সহ পশ্চিম জোনের দায়িত্বে আছেন একজন। দক্ষিণ-মধ্য এবং পশ্চিম-মধ্য জোনের দায়িত্বে, বারাণসীতে রেলের ডিজেল লোকোমোটিভ কারখানা, কাপুরথালায় রেল কোচ কারখানার দায়িত্বে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম জোন ও রেলের চাকা তৈরির কারখানার দায়িত্বেও আছেন একজন করেই প্রশাসক।

রেল প্রশাসনের মাথায় যখন এত অব্যবস্থা ও শূন্য পদ, তখন নিচের দিকের অবস্থা তো আরও খারাপ হবেই। ভারতীয় রেল সবচেয়ে বেশি কর্মী নিয়োগের জায়গা। অথচ এখানে বর্তমানে প্রায় দু'লক্ষ পদ ফাঁকা পড়ে আছে। যার মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভাগেই শূন্য পদ ৯০ হাজার। দুর্ঘটনাগ্রস্ত কালকা মেল পূর্ব রেলওয়ের এক্তিয়ারে। এই বিভাগে ৮ হাজার পদ খালি, যার অর্ধেকই নিরাপত্তা বিভাগের। রেলকর্তাদের অভিযোগ, রেল সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত গ্যাংম্যান, ট্রলিম্যান, কেবিনম্যান, সহকারি স্টেশনমাস্টার সহ সব মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। রেলের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান, যার সাথে লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা জড়িত, সেখানে এই অবহেলা কেন? কেন রেলের এত শূন্যপদে নিয়োগ হচ্ছে না? গত কয়েক বছর আগে নিয়োগ প্রক্রিয়া কিছুটা শুরু হলেও তা অত্যন্ত ঢিমেতালে চলছে। ২০০৬ সালে গ্রুপ ডি ক্যাটাগরিতে ৩৬ হাজার ৯০০ পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। ৫ বছর পেরিয়ে গেলেও তার লিখিত পরীক্ষা এখনও পর্যন্ত হয়নি। গত বছর ৮৫,০৬৮টি পদের জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা হলে দেড় কোটি আবেদনপত্র জমা পড়ে। তা ঝাড়াই বাছাই-ও করে উঠতে পারেনি রেল। ফলে রেলের সব বিভাগেই কর্মী ঘাটতি। আর এর প্রভাব পড়ছে যাত্রীদের নিরাপত্তায়। দেশের মোট

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

চিন্তার সংঘর্ষ না থাকলে নেতাদের অগ্রগতি হয় না, কর্মীদেরও হয় না

(৫ই আগস্ট এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস উপলক্ষে মহান নেতার শিক্ষা থেকে কিছু কিছু অংশ আমরা প্রকাশ করছি।)

সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিবাদী প্রবণতা, অহম্ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য একজন ব্যক্তির যে সংগ্রাম তা যদি বৃহত্তর সামাজিক সংগ্রামের সঙ্গে, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না হয় তাহলে উদ্দেশ্য যতই সৎ হোক না কেন তার পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তির সংগ্রামকে সবসময় সমষ্টির সংগ্রামের সাথে মেলাতে হবে। কিন্তু এই সমষ্টিগত সংগ্রামকেও সঠিক পথে পরিচালনার জন্য এবং ভুলত্রুটি থেকে তাকে মুক্ত রাখার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তা চালানো প্রয়োজন। তাই জনসাধারণের মধ্যে পড়ে থেকে দলের রুটিন ওয়ার্ক চালানোর মধ্যে কর্মীদের যে একটা ঢিলেঢালা গতানুগতিক মনোভাব আছে তাকে দূর করে কাজের গতিকে যেমন আপনাদের বাড়াতে হবে, তেমনি সাথে সাথে তা সুপরিকল্পিতভাবে করতে হবে। যদি দেখা যায়, কাজের গতি দ্রুত হচ্ছে কিন্তু তা পরিকল্পিতভাবে হচ্ছে না তাহলে তাতে হবে না। হয়তো ছোটাছুটি করে আপনারা একটা কিছু করে ফেললেন, কিন্তু দেখা গেল সেই করার পেছনে কোনও পরিকল্পনা নেই, আদর্শগত ভিত্তি নেই, তা সমষ্টিগত পরিকল্পনায় করা হয়নি তাহলে তা দাঁড়াবে না। তাতে অযথা সময়ের অপব্যবহার হবে। কাজেই আমার বক্তব্য এটা নয় যে, কাজের ক্ষেত্রে আপনারা লাফিয়ে লাফিয়ে কতটা এগিয়ে যেতে পারলেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনারা হেঁটেই যাবেন বা সামর্থ্য অনুযায়ী দৌড়েই যাবেন, কিন্তু যাবেন পরিকল্পনার ভিত্তিতে, সুষ্ঠু নেতৃত্বের অধীনে। ব্যক্তিগত আচরণ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার যে ঝোঁক প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে তাকে সমাজচেতনার দ্বারা প্যাটার্ন করে, টিউন করে আপনাদের চলতে হবে।

এইভাবে পরিকল্পনার ভিত্তিতে সুষ্ঠু নেতৃত্বের অধীনে পার্টির কর্মসূচিগুলি যদি আপনারা রূপায়িত করতে থাকেন এবং সাথে সাথে পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে কোথায় কী ত্রুটি আছে সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করে কীভাবে তাকে আরও সুন্দর করা যায় সেই চেষ্টা করতে থাকেন তাহলে দ্রুত সংগঠনকে প্রয়োজন অনুযায়ী শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড় করাতে আপনারা সক্ষম হবেন। কিন্তু সমালোচনার ধারা যদি আপনাদের এই হয় যে, আপনারা 'ত্রুটি আছে', 'কিছুই হচ্ছে না' শুধু এই বলতে থাকেন তাহলে সেটা হবে নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। এর অর্থ হচ্ছে আপনারা কিছু করবার জন্য সমালোচনা করছেন না। আপনারা যে কিছু করছেন না সেটা আড়াল করার জন্য সমালোচনা করছেন। আপনারা মনে রাখবেন, নিজের সমালোচনার চরিত্র কী তাও ধরবার কতকগুলো উপায় মার্কসবাদী বিজ্ঞান তুলে ধরেছে। যখন আপনাদের বক্তব্যের মধ্যে শুধু নেগেটিভ ক্রিটিসিজম থাকে, বিক্ষোভ থাকে, বিক্ষোভই হচ্ছে যার আধার — অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দলকে কী বাদ গিয়ে কী গ্রহণ করতে হবে তা আপনারা বলেন না, শুধু এটা হচ্ছে না, ওটা হচ্ছে না, এটা কেন হবে, ওরকম করার মানে হয় না, এরকম করলে কী করে হবে — এইসব বলে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন তখন বুঝতে হবে এর অর্থ হচ্ছে, আপনারা যে কিছু করতে পারছেন না সেইটা যখন ধরা পড়ছে তখন আসলে অপরের দোষের মধ্যে তার কারণ খোঁজেন।

যাঁরা এভাবে চিন্তা করছেন তাঁদের ভাবতে হবে তাঁরা নিজেরা কী করেছেন বা পার্টির প্রোগ্রামে যদি কিছু ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে কী সেই ত্রুটি এবং কী সেই প্রোগ্রাম যে প্রোগ্রাম তাঁদের ওখানে নেওয়া দরকার ছিল। এইটুকুই হবে তাঁদের বিচার্য বিষয়। তাঁদের অসন্তুষ্ট হওয়ার বা মন উৎক্ষিপ্ত হওয়ার কোনও 'পয়েন্ট' এখানে নেই বা বিক্ষোভের কোনও পয়েন্ট নেই। শুধু এইটুকু অতৃপ্তি থাকতে পারে যে তাঁরা নিজেরাই তাঁদের কাজে সন্তুষ্ট নন। আর বাকি সব জিনিসটাই হচ্ছে তাঁদের অহম্ যেটা তাঁদের ঠকাচ্ছে — নিজেরা যে পারছেন না সেই দোষটাই হয় পার্টির পরিকল্পনা, নাহয় সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। হয়তো অনেক সময় এগুলোও 'ইমপর্টেন্ট পয়েন্ট' হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে সেগুলো কংক্রিট পয়েন্ট হিসাবে আসবে। অর্থাৎ কংক্রিটলি বলতে হবে, কী বিশেষ ধরনের প্ল্যান নেওয়া উচিত ছিল যেটা নেওয়া হয়নি, বা অমুক নেতা যে প্ল্যানটা দিয়েছিলেন সেটা ব্যর্থ এবং অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে এইভাবে হলে কাজগুলো হতে পারত। কিন্তু যাঁরা বিক্ষোভ প্রকাশ করেন, যাঁরা সমালোচনা করেন, যাঁরা 'রিমার্ক পাস' করেন বা যাঁরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন তাঁরা কি এইভাবে কংক্রিট পয়েন্ট তুলে আলোচনা করেন? করেন না। আবার দেখা যায় একদল কর্মী আছেন, তাঁরা যে এলাকায় কাজ করেন সেখানে যখন কাজে এগোতে পারেন না তখন মনে করেন ঐ জায়গাটাই হচ্ছে স্পেশ্যাল, একটু অন্যরকম, বিচিত্র অসুবিধার জায়গা। তাঁরা মনে করেন, ঐরকম জায়গা অন্য কোথাও নেই। ফলে তাঁরা বলতে থাকেন, এলাকার পরিবেশ ভয়ানক প্রতিকূল সেইজন্য তাঁরা কিছু করতে পারছেন না। অর্থাৎ তাঁরা পরিবেশের মধ্যে নিজেদের না করতে পারার কারণ খুঁজে বেড়ান। এর দ্বারা আসল কথাটা তাঁরা ধরবার চেষ্টা করেন না। এবং তাঁরা নিজেদের ঠকান। তাঁরা ধরবার চেষ্টা করেন না তাঁদের কী করণীয় ছিল যা তাঁরা করেননি। সেইটিই যদি তাঁরা ধরতেন তাহলে তাঁরা দেখতেন, ঐসব হাজার অসুবিধার মধ্যেও তাঁদের অনেক কিছু করার ছিল এবং তাঁরা কিছু করতে পারতেন। ফলে প্রতিটি কর্মীর সবসময় এইভাবে আলোচনা করা উচিত। আগে নিজেদের দিক থেকে দেখা উচিত কী তাঁদের করণীয় ছিল যা তাঁরা করেননি এবং কোথায় তাঁদের ত্রুটি।

নেতাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কোনও কর্মী একটা কাজ পারেনি। একজন নেতা সেক্ষেত্রে নিজের দিক থেকে প্রথম এই প্রশ্নটা শুরু করবেন যে, তিনি সেই কর্মীটির ক্ষেত্রে, তার ক্ষমতা যতটুকু আছে ততটুকুর মধ্যে যাতে সে পারে তা করাবার জন্য কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং সে ব্যাপারে কর্মীটিকে তিনি কী সাহায্য করেছেন। নেতার নিজের দিক থেকে দেখতে হবে — প্রথমত সেই সাহায্য করার দিকটা ঠিক আছে কিনা। তারপর দেখতে হবে, কর্মীটি তার কী কী সীমাবদ্ধতার জন্য কাজটা করতে পারেনি এবং সেই 'অবজেকটিভ ডিফিকালটি'গুলি (বাস্তব অসুবিধাগুলি) কী, সেইগুলো সম্বন্ধে নেতা তাকে ঠিকমতো বুঝিয়ে দেবেন। তারপরেও যদি দেখা যায় যে, কর্মীটির যা করার ছিল তা করেনি তখন তাকে সেইটা পয়েন্ট আউট করতে হবে। কিন্তু নেতারা সবসময় তা করেন না। প্রায়শই যে কর্মীটি পারেনি তাকে তৎক্ষণাৎ অপদার্থ ধরে নিয়ে তাকে চাপাচাপি করেন। কর্মীরা কাজ করতে না পারার জন্য যে দায়িত্বটা নেতাদের ওপর বর্তাচ্ছে সেই দায়দায়িত্ব এড়াবার ঝোঁকটি অজ্ঞাত সাইকোলজিতে নেতাদের এইভাবে ডিসিভ করে। একথার মানে এ নয় যে, নেতাদের দোষের জন্যই কর্মীরা পারছে না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, নেতাদের যদি দোষের দিক না থেকে থাকে তাহলে তাঁরা বিষয়টিকে সঠিকভাবে অ্যাপ্রোচ না করে কর্মীদের ওপর গোড়াতেই মারমুখী হয়ে ওঠেন কেন?

আর একটা কথাও নেতাদের এখানে মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে, দলের সমস্ত কর্মী এবং সমর্থক এক স্তরের নয়। কাজ করতে না পারার ক্ষেত্রে কর্মীদের বিভিন্ন ধরন থাকে এবং সেইটা বুঝে নানান স্তরে তাদের 'ট্যাকল' করতে হয়। বিভিন্ন কর্মীর এই যে বিভিন্ন ধরন সেইটা না বিচার করে একইরকম ঢালাওভাবে, ঢালাও ফর্মুলায় সব কর্মীকে ট্যাকল করতে গেলে 'পারটিকুলারিটি অব কনট্রাডিকশন'-এর (বিশেষ দ্বন্দ্বের বিশেষ অবস্থা) তত্ত্বকেই অস্বীকার করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় একজন কর্মী সৎ হওয়া সত্ত্বেও 'জেনুইন' কতকগুলো 'কনফিউশন' বা দোষের জন্য — যেগুলি সম্পর্কে সে 'অ্যালার্ট' নয় বা অ্যালার্ট হওয়া সত্ত্বেও 'বিইং ভিকটিম অব সার্টেন হ্যাবিটস অ্যান্ড ট্রেন্ডস' (কিছু ক্ষতিকারক অভ্যাস ও কর্মধারার শিকার হওয়ায়) অনেক সময় নিজেকে রক্ষা করতে পারে না বা চেষ্টা করেও সে পারছে না। সেক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেই কর্মীটিকে সেইগুলো শোধরাবার জন্য নেতাদের বারবার ধৈর্যের সাথে চেষ্টা করা উচিত। যেখানে সে পারছে না — যেহেতু এটা জানাই আছে খানিকটা যে সে পারছে না — সেখানে তার ওপরে মারমুখী হওয়ার চেয়ে সহানুভূতির সাথে সাহায্য করাটাই হবে নেতাদের বড় কর্তব্য। আবার নেতাদের মনে রাখতে হবে, এই 'সিমপ্যাথেটিক্যাল ট্রিটমেন্ট' এবং হেল্প্টা যেন পার্টি চিন্তা বা পদ্ধতি বহির্ভূত কোনও একজন নেতার শুধুমাত্র ব্যক্তিচিন্তার ওপর ভিত্তি করে না হয়। সেই বিশেষ সমস্যাটা, তার রূপ বা চরিত্র অনুযায়ী স্টাডি সার্কেলে এবং আর পাঁচজনের সামনেও আলোচনা করা যেতে পারে, আবার রূপ ভেদে সবার সামনে না হয়ে নেতাদের মধ্যে বা যাদের সামনে আলোচনা করা যায়, করা যেতে পারে। সব জিনিস সবার সামনে আলোচনা করা না যেতে পারে, কিন্তু পার্টির কারোর না কারোর সামনে আলোচনা করা অবশ্যই উচিত। এটা কেবলমাত্র একজন নেতার ব্যক্তি ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তি ট্যাকলিং যেন কখনই না হয়। তিনি যেভাবে বিষয়টাকে ট্যাকল করছেন সেটা পার্টির তত্ত্ব বা পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া চাই — অর্থাৎ তিনি যে পদ্ধতিটি একজন কর্মীকে ট্যাকল করার ক্ষেত্রে গ্রহণ করছেন সেটা পার্টির দ্বারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি হওয়া চাই। আবার এটাও নিশ্চিতরূপে বুঝতে হবে যে, এই ট্যাকলিং-এর মধ্যে খানিকটা ব্যক্তি মিশে থাকে, যেটা যিনি ট্যাকল করছেন তাঁর নিজস্ব। তাঁর দিক থেকে তিনি তাঁর মতন করে করছেন। কিন্তু কোন সমস্যাকে ট্যাকল করার ক্ষেত্রে ঐ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনমতেই তা পার্টি তত্ত্ব বা উপলব্ধির সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত সেই নেতার কেবলমাত্র নিজস্ব ব্যক্তি চিন্তা বা পদ্ধতি হতে পারে না। এইভাবে ট্যাকলিং-এর ফল যদি আপাতদৃষ্টিতে ভালোও দেখা যায় তাহলেও তা করা চলবে না। কারণ ভালো ফল হওয়া মানেই শেষ পর্যন্ত ভালো ফল বর্তায় না। ভালো ফল বর্তাচ্ছে মনে করে যিনি এইভাবে সমস্যার সমাধান করে দেন, শেষপর্যন্ত তার বেশিরভাগ সময়ই কুফল বর্তে যায়। এই হচ্ছে দলের অভিজ্ঞতা।

যে কর্মীটিকে ট্যাকল করে দেওয়া হল সে যদি খুব খুশি হয়েও যায় তাতেও খুব ভালো ট্যাকলিং হয়েছে এটা সবসময় প্রমাণ হয় না। কারণ মানুষ বহু কারণে খুশি হয়। ধরা যাক, কোনও লোক একটা কাজ ঠিক করেনি বা তার কোনও একটা আচরণ ঠিক হয়নি। এখন কেউ যদি সেই লোকটিকে ট্যাকলের নামে বক্তব্যের মধ্যে তার সেই বেঠিক কাজ বা আচরণকেই নানারকমভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 'প্যাট্রনাইজ' (সমর্থন) করে যান, আর তার দ্বারা সেই লোকটি খুশি হয়ে চলে যায় তাহলে কি সমস্যা সমাধান হয়েছে বলা যাবে? সে খুশি হওয়াতে কী হবে? তার সর্বনাশ হবে। কাজেই অখুশি হলেই খারাপ ট্যাকলিং হল, আর খুশি হলেই ভালো ট্যাকলিং হল — এরকম নয় বিষয়টা। তবে ভালো ট্যাকলিং — অর্থাৎ শেষপর্যন্ত ট্যাকলিং সার্থক হয়েছে এর একটা লক্ষণ হচ্ছে, যে গোড়ায় অখুশি হবে সে আলোচনার শেষে নিশ্চয় খুশি হয়ে উঠে যাবে। আলোচনার শুরুতে যদি দেখা যায় কেউ অখুশি বা বিক্ষুব্ধ হচ্ছে বা বুঝতে চাইছে না — এর অর্থ হচ্ছে তার নিজস্ব অহমের সাথে পার্টির ধ্যানধারণা ও উপলব্ধির বিরোধ লাগছে। তারপরে যখন সে যুক্তির দ্বারা বিষয়টা সত্যি সত্যি বুঝতে পারে তখন সে খুশি হয়। আবার এরকমও দেখা যায় যে, অনেকে যুক্তিতে মেনে নেয় কিন্তু খুশি হয় না। এরকম হলে বুঝতে হবে, যিনি ট্যাকল করছেন তিনি খানিকটা সফল হয়েছেন কিন্তু পুরোপুরি সফল হননি। অর্থাৎ আলোচনার শেষে যার সাথে আলোচনা হচ্ছে তিনি বক্তব্যটা ঠিক বলে মেনে যান, কিন্তু মুখটা তার হাসিখুশিতে জ্বলজ্বল করে না, বিষাদাচ্ছন্ন এবং গম্ভীর হয়ে তিনি উঠে যান — তাহলে বুঝতে হবে যিনি ট্যাকল করছেন তিনি খানিকটা সাকসেসফুল হয়েছেন, পুরোপুরি নয়। এগুলো হচ্ছে খুব 'পারফেকশনে' (নির্ভুল) ট্যাকল করার মেথড হিসাবে যে দিকটায় নেতাদের নজর রাখা প্রয়োজন তার কথা। নেতারা যদি মারমুখী না হয়ে যুক্তি দিয়ে কারোর বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে তিনি সেই কর্মীটির ভুল ধরতে পারবেন এবং ভুল ধরতে পারলে তা তাকে দেখাতে পারবেন। আর একটা কথা মনে রাখবেন, ভুল দেখাতে পারলে তা নেতাকেও ভুলের ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের একটা কথা হচ্ছে, সংগ্রাম ব্যতিরেকে কোন জিনিসের অগ্রগতি হয় না। নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যদি চিন্তার সংঘর্ষ না থাকে তবে নেতাদেরও অগ্রগতি হয় না, কর্মীদেরও হয় না।

কমরেড, আজকের পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে একটু কঠিন মনে হলেও বিপ্লবীরা জানে এরকম হাজার বাধা-বিপত্তির মধ্যেই তাদের কাজ করে যেতে হয়। কিন্তু সকল বাধা-বিপত্তির সামনে সঠিক মূল রাজনৈতিক লাইন, সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব, আর কষ্টসাধ্য সংগ্রাম শেষপর্যন্ত বিপ্লবকে জয়যুক্ত করে। ইতিহাসের এইটাই শিক্ষা। এই শিক্ষা মনে রেখেই আপনাদের ধৈর্যের সাথে পরিকল্পনা করে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে কাজ করে যেতে হবে, নিজেদের ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করে করে ক্রমাগত নিজেদের কাজের পদ্ধতি উন্নত ও নিখুঁত করার চেষ্টা চালাতে হবে। ... অন্যদিকে আদর্শগত ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে পারবেন তত দ্রুত এবং ততদূর পর্যন্ত আপনারা শ্রমিক-চাষি ও মেহনতি জনগণের চেতনার মানের উন্নতিতেও সাহায্য করতে পারবেন। এবং যত দ্রুত আপনারা এই দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারবেন বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণটিও তত কাছে এগিয়ে আসবে। আমি এই আশা নিয়েই আজ আমার বক্তব্য শেষ করছি যে, আপনারা এই চ্যালেঞ্জ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবেন এবং এই সংগ্রামে সকল শক্তি নিয়ে নিজেদের নিয়োজিত করবেন।

—'যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক'
(নির্বাচিত রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড)

জয়নগরে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

বিরাট এলাকা নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের কাজ। জয়নগর-কুলতলীর মতো দু'টি থানা এলাকা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী মন্দিরবাজার, মগরাহাটের কিছু অংশও এর সাথে যুক্ত। এখানে বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৪৩,০০০। কয়েক মাসের মধ্যেই সংখ্যাটা ৭০,০০০-এ পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ঐ অফিস থেকে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ১৬,৫০০ এবং ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত আরও ৪-৫ হাজার ফর্ম জমা পড়েছে। তার সাথে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন যোজনার বিপিএল গ্রাহকের সংখ্যা অন্তত ১৫ হাজার যোগ হবে। তাই সম্ভাব্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের চাপ কমাতে জয়নগর সাপ্লাই অফিস মাসাধিককাল ফর্ম দেওয়ার কাজ পুরোপুরি ও জমা নেওয়ার কাজ কার্যত বন্ধ রেখেছিল।

এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে অ্যাবেকার জয়নগর শাখার উদ্যোগে ১২ জুলাই জয়নগর গ্রুপ সাপ্লাই অফিসের সামনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা কয়েকশো বিদ্যুৎ গ্রাহক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান সংগঠক কল্যাণেন্দু বসু। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অসিত দাস দাস এবং জেলা সম্পাদক দিব্যেন্দু মুখার্জী। তাঁরা গ্রামে গ্রামে কমিটি গড়ে তুলে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান। জয়নগর ও কুলতলী বিধানসভা এলাকায় দু'টি ৩৩/১১ পাওয়ার সাবস্টেশন এবং কুলতলী ও দক্ষিণ বারাসতে গ্রুপ সাপ্লাই অফিসের দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি এবং নতুন সংযোগের জন্য ফর্ম দেওয়া ও জমা নেওয়া, আইনানুগ সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া, অকেজো তার, ট্রান্সফরমার পাল্টে দেওয়া, লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ বন্ধ করা, অন্যথায় গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া ইত্যাদি দাবি সংবলিত আর একটি স্মারকলিপি পাঠ করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী সঞ্জয় ঘোষ। স্টেশন ম্যানেজার সমস্ত ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ আইন মেনে চলার ও যথাযথ গ্রাহক পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

বন্যায় সাড়ে ৩৫ কোটি টাকার ফসলের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ডেপুটেশন

বন্যা ও অতি বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, সারের কালোবাজারি রোধ, সরকারি মূল্যে কেরোসিন সহ অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ, ডিজেল, কৃষি বিদ্যুৎ স্বল্পমূল্যে সরবরাহ, ন্যায্যমূল্যে সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনা, কৃষি পেনশন সহ কৃষকদের নানা দাবিতে সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৭ জুলাই জেলা পরিষদের সভাধিপতি, কৃষি দপ্তরের উপ-কৃষি অধিকর্তা এবং জেলার খাদ্য নিয়ামকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক নন্দ পাত্র, কার্তিক বেরা, উৎপল প্রধান ও মেদিনীপুর জেলা ফুলচাষি সমন্বয় কমিটির সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নস্কর। একই দাবিতে ১১ জুলাই জেলার ব্লকগুলির সহ অধিকর্তা (কৃষি)-র কাছেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে সমস্ত স্তরের কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। এ ব্যাপারে তাঁরা রাজ্যের কৃষিদপ্তর ও হর্টিকালচার দপ্তরের মন্ত্রীকেও শীঘ্রই স্মারকলিপি দেবেন বলে জানান।

প্রাকৃতিক দুর্যোগকে হার মানিয়ে ক্যানিং-এ যুব সম্মেলন

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার গোপালপুরে ৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় আঞ্চলিক যুব সম্মেলন। ঐ সময় কয়েকদিনের ধারাবাহিক বর্ষণের মধ্যেই স্থানীয় ডি ওয়াই ও কর্মীরা কাদা-জল মাড়িয়ে দিনে রাতে যুবকদের কাছে গিয়েছে, সংগঠনের সদস্য করেছে, সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই শুরু হয় প্রকাশ্য অধিবেশন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, বিশেষ অতিথি এস ইউ সি আই (সি) জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বাদল সরদার, কমরেড ইয়াহিয়া আখন্দ এবং ডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রামপ্রসাদ মিস্ত্রি। ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, কৃষক জীবনের ব্যথা বেদনা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুতের অভাব, যুবকদের বেকারিত্বের দুঃসহ যন্ত্রণা, সাংস্কৃতিক অধঃপতনের মূল কারণ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। তিনি এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পরিপূরক যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভাশেষে বৃষ্টির তাণ্ডবকে উপেক্ষা করে সহস্রাধিক উদ্দীপ্ত মানুষ ঘরে ফেরেন।

সন্ধ্যায় প্রতিনিধি অধিবেশনে মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড হাবিবুল্লা আখন্দ। বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। কমরেড মহেশ্বর নস্করকে সভাপতি ও কমরেড জাকারিয়া আখন্দকে সম্পাদক করে ২৪ জনের আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

ঝালদায় অসংগঠিত শ্রমিকদের কর্মশালা

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত পুরুলিয়া জেলা রিক্সা ও রিক্সাভ্যান চালক ইউনিয়নের উদ্যোগে ঝালদা শহরে ১৭ জুলাই আয়োজিত হল শতাধিক অসংগঠিত শ্রমিকের কর্মশালা। রিক্সা শ্রমিক ছাড়াও, মোটর গ্যারেজ শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, দিনমজুর, স্ট্রিট হকার, পরিবহন শ্রমিক এবং পরিচারিকারা বিপুল উৎসাহে এই কর্মশালায় যোগ দেন। সহকারী শ্রম মহাধ্যক্ষ (পুরুলিয়া পশ্চিম) শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অবহিত করেন। উল্লেখ্য, এ আই ইউ টি ইউ সি পুরুলিয়া জেলা কমিটি প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য দীর্ঘদিন লড়াই করে অবশেষে প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে শ্রমিকদের পি এফ সহ সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে সফল হয়। এই জয়ে স্বভাবতই শ্রমিকরা উচ্ছ্বসিত। কর্মশালায় গ্যারেজ শ্রমিক সংগঠক দীপক কর্মকার, এ আই ডি ওয়াই ও পুরুলিয়া জেলা সংগঠক রামনাথ মাহাত, রিক্সা ও রিক্সাভ্যান চালক ইউনিয়নের সহসভাপতি বলদেব বাউরি, এ আই ইউ টি ইউ সি পুরুলিয়া জেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ মধুমিতা মাহাত এবং এস ইউ সি আই (সি) ঝালদা লোকাল কমিটির সম্পাদক তপন রজক উপস্থিত ছিলেন।

ফিলিপিন্সে কমরেড রণজিৎ ধর

তিনের পাতার পর

লিবিয়া থেকে ন্যাটোর সামরিক বাহিনী সরাবার দাবিতে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন।

কোনও দেশ কীভাবে চলবে, তার আভ্যন্তরীণ সমস্যা সে কীভাবে মেটাবে বা কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা সে চায়, তা ঠিক করার অধিকার তার সম্পূর্ণ নিজের। লিবিয়ার মানুষই একমাত্র ঠিক করবে যে, গদ্দাফি যাবেন না থাকবেন। সিরিয়াতেও একই কান্ড ঘটছে, গণতন্ত্রের ভেক ধরে সেখানকার মানুষকে রক্ষা করার কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইতিমধ্যেই সেখানে ঢুকেছে।

একইভাবে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মায়ানমারের মানুষের জন্য এবং তাদের গণতন্ত্রের জন্য কুম্ভীরাশ্রু ফেলছে। অথচ তারা সেখানকার মিলিটারি জুন্টা এবং শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর সাথে সবরকমের যোগাযোগ রাখছে নিজেদের অর্থনীতির স্বার্থে। জুন্টার বিরুদ্ধে তারা অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকি দিচ্ছে আরও লোভনীয় সুযোগ আদায়ের আশায়, আরও বেশি করে ওদেশের বাজারে ঢুকে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠের আশায়, সাথে সাথে বিশ্বের মানুষকে বোকা বানিয়ে গণতন্ত্র রক্ষার চ্যাম্পিয়নও সাজছে তারা। তারা নেপালের আভ্যন্তরীণ বিষয়েও নাক গলাচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়া বর্তমানে মার্কিন সামরিক কেন্দ্র এবং ফরোয়ার্ড বেসে পরিণত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়ার হাত থেকে বাঁচানোর কথা বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত ৬০ বছর ধরে দক্ষিণ কোরিয়াতে তাদের মিলিটারি বাহিনী রেখে দিয়েছে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, সারা বিশ্বে যেখানেই সংঘর্ষ ঘটবে, সেখানেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোরিও বাহিনী (ইউ এস কে এফ) যাবে শান্তি রক্ষার ভাণ দেখিয়ে।

বাস্তবে যেদিন থেকে উত্তর কোরিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেছে, সেদিন থেকেই উত্তর কোরিয়া তাদের প্রধান লক্ষ্য, জঘন্য অর্থনৈতিক অবরোধ তাদের উপর চাপিয়ে রাখা হয়েছে। উত্তর কোরিয়ার জনগণ এবং সরকার সমাজতন্ত্রকে রক্ষার জন্য সেখানে সাহসের সাথে লড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া সহ অন্যান্য বন্ধু সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাহায্যে সামরিকভাবে উত্তর কোরিয়াকে ঘিরে রেখেছে এবং ভয় দেখাচ্ছে যে, যদি সে মার্কিন হুমকি অনুযায়ী তার আনবিক অস্ত্র ধ্বংস না করে তাহলে তার ফল তাকে ভুগতে হবে। যদি উত্তর কোরিয়াকে দুর্বল করার এই মার্কিন চক্রান্ত সফল হয় তাহলে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রবল মার্কিন হুমকির মুখে পড়বে। সংগ্রামী ফিলিপাইন জনগণ জানে যে, মার্কিন হস্তক্ষেপের ফলে কীভাবে ফিলিপাইন ধনিক শ্রেণী লাভবান হয়েছে, আর সাধারণ জনগণ চরম দারিদ্র, অভাব অনটন, হিংসা এবং জাতিদাঙ্গায় দীর্ণ বিদীর্ণ হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের ইতিহাসের কথা সকলের জানা আছে।

এভাবেই সারা বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের জাল বিস্তার করছে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার আশংকা তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। প্রতিদিন প্রতিটি দিকেই এর লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। যত পদক্ষেপই নেওয়া হোক না কেন, জনগণের রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা আজ গ্রিসে, গতকাল লিবিয়ায়, তার আগের দিন তিউনিসিয়ায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই বিক্ষোভের মধ্যে লাল পতাকা দেখে সাম্রাজ্যবাদীরা আরও ভয়ঙ্করভাবে একে দমন করতে উদ্যত হচ্ছে। মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের এই দস্যুবৃত্তি, দৌরাত্ম্য, বড়দা সুলভ আচরণে বিশ্বের কোনও স্বাধীনতা প্রিয় মানুষই চুপ করে থাকতে পারে না। মুক্তি আন্দোলনের রাস্তাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া, সংগঠিত হয়ে দাঁড়ানো এবং দীর্ঘ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতির সময় বর্তমানে এসেছে। সাম্রাজ্যবাদী, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সশস্ত্র আগ্রাসন এবং হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে সারা পৃথিবীর মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। বিশ্বের নানা প্রান্তে এইসব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলিকে সংযোজিত করার মধ্য দিয়েই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিশ্বজোড়া একটি শক্তিশালী জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা আজকের দিনের সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন। যে কোনও দেশের উপর আক্রমণকে নিজের দেশের উপর আক্রমণ বলেই বিবেচনা করবে এই আন্দোলন। তাই এই ধরনের প্রত্যেকটি আক্রমণকে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করার জন্য প্রতিটি দেশের যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক মানুষের কর্তব্য হল, এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। অন্য কথায় বলা যায় যে, এ লড়াই শুধু সংহতি প্রকাশ করে তাই নয়, একতাবোধও এর মধ্য দিয়ে জন্মায়। এই ধরনের সংহতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ যদি লড়াকু মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে তাহলে এ শুধু বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে তাই নয়, শত্রুর বুকেও কাঁপন ধরিয়ে দেবে। এর ফলে ব্যর্থ হবে একের বিরুদ্ধে অন্যকে লড়িয়ে দেবার সাম্রাজ্যবাদীদের পুরানো কৌশল বা দেশ দখল করে সেখানে রক্তের বন্যা বইয়ে দেবার চক্রান্ত। একথা বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে, এইসব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন যদি সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে গড়ে না ওঠে তাহলে তারা তাদের আকাঙ্খিত লক্ষ্যে না পৌঁছে অর্ধপথে শেষ হয়ে যাবে। সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একমাত্র সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত এবং সারা বিশ্বকে শৃঙ্খলমুক্ত করা সম্ভব।

ঘুটিয়ারী শরীফ-চম্পাহাটি আঞ্চলিক যুব সম্মেলন

১৭ জুলাই প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ঘুটিয়ারী শরীফ-চম্পাহাটি আঞ্চলিক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড পালান মণ্ডল এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমরেড প্রাণতোষ সরদার সহ ৬ জন প্রতিনিধি। সভাপতিত্ব করেন কমরেড পিন্টু নস্কর। বক্তব্য রাখেন জেলা সংগঠক কমরেড সঞ্জয় মণ্ডল ও এস ইউ সি আই (সি)-র আঞ্চলিক কমিটির সদস্য কমরেড নারায়ণ নস্কর। প্রতিনিধি অধিবেশনে কমরেড সামসুদ্দিন নস্করকে সভাপতি ও কমরেড বাপি মণ্ডলকে সম্পাদক করে কমিটি গঠিত হয়। বিকালে প্রায় শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন দলের আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড প্রতাপ নস্কর ও সদস্য কমরেড লীলাময় মণ্ডল এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। বক্তারা বলেন, পুঁজিবাদ বেকারদের কাজ দিতে পারে না। তাই কাজ পাওয়া সম্পর্কে সঠিক চেতনা যাতে যুবকদের মধ্যে না জন্মায় তার জন্য তারা শিক্ষা-সংস্কৃতিকে মেরে দিতে চায়। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করা পর্যন্ত যুব সমাজের যথার্থ মুক্তি নেই।

মুর্শিদাবাদে শিশুমৃত্যুর তদন্ত দাবি

বহরমপুর সদর হাসপাতালে ১৭টি শিশুর মৃত্যুর প্রতিবাদে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার (এম এস সি) এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ১০ জুলাই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে হাসপাতাল সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এম এস সি-র জেলা সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলমের নেতৃত্বে প্রতিনিধিরা শিশুমৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের শাস্তির দাবি করেন। তাঁরা হাসপাতালের পরিকাঠামোর উন্নতি এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতি বাতিলের দাবি জানান।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল - বাসদ-এর আহ্বান

বুর্জোয়া দ্বি-দলীয় পাল্টাপাল্টির বিপরীতে বাম বিকল্প গড়ে তুলুন

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সংবিধান সংশোধন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ পাচারের ষড়যন্ত্র সহ জনজীবনের সংকট নিরসন এবং বামপন্থীদের করণীয় সম্পর্কে ২৯ জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ বুর্জোয়া দ্বি-দলীয় পাল্টাপাল্টির বিপরীতে বাম বিকল্প গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। সেখানে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেডস মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, জাহেদুল মিলু, রাজেকুজ্জামান রতন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাবহির্ভূত দুই প্রধান বুর্জোয়া দলের ক্ষমতাকেন্দ্রিক বৈরী দ্বন্দ্ব আবারও এক গভীর রাজনৈতিক সংকট ও সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে দেশকে ঠেলে দিয়েছে। দেশের মানুষের মনে অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান বাস্তবতাকে ঘিরে এক অজানা আতঙ্ক বিরাজ করছে। দ্রব্যমূল্যের চাপে, বেকারত্বের অভিশাপে, সন্ত্রাসের আতঙ্কে, লুঠপাটের দৌরাত্ম্যে, দলীয়করণ-দুঃশাসনের দোর্দণ্ড প্রতাপে জনজীবন অতিষ্ঠ ও দিশেহারা। জাতীয় সম্পদ তেল-গ্যাস-কয়লা বেহাত হয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সাথে জাতীয় স্বার্থবিরোধী অতীত চুক্তিগুলির মতো এবারও সমুদ্র ব্লকের চুক্তি করা হয়েছে এবং তা গোপন রাখা হয়েছে। বাপেক্স-এর কাছ থেকে যে পরিমাণ গ্যাস ২৫ টাকায় কেনা হয়, সেই গ্যাস ৩১০ টাকায় বিদেশিদের কাছ থেকে কিনতে হচ্ছে। পিডিবি উৎপাদিত বিদ্যুৎ যেখানে ৩ টাকায় পাওয়া যায় সেখানে কুইক রেন্টাল-এর নামে একই বিদ্যুৎ ১২-১৪ টাকায় কিনতে হচ্ছে। বাজারে আগুন জ্বলছে, যে আগুনের উত্তাপে মানুষের পেট পুড়ছে, ঘর ভাঙছে। এসব নিয়ে বিরোধী পক্ষের (খালেদা জিয়ার বিএনপি ও সহযোগীদের) জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, ক্ষোভ-উষ্মা প্রকাশ তো দূরের কথা, সাধারণ আলোচনাও নেই। প্রথমে বিরোধী ও সরকারি পক্ষের (শেখ হাসিনার আওয়ামী লিগ) মধ্যে সামনের সারির আসন ও ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি রক্ষা নিয়ে পার্লামেন্টে সরকারি দলের গর্জন ও বিরোধী দলের বর্জন শুরু হয়। এখন আগামী দিনে ক্ষমতায় থাকার এবং ক্ষমতায় যাওয়ার রাস্তা কার জন্য কত মসৃণ হবে এবং কার ক্ষমতায় যাওয়ার রাস্তায় কাঁটা বসানো হবে এই নিয়ে বিতর্ক চলছে। ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি, বেতন-ভাতা-সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে উভয়ের হর্ষধ্বনি দেশবাসী উপভোগ করেছিল এই ভেবে যে, এরা অন্যায্য, অনৈতিক সুবিধা নিলেও দেশবাসীকে অসুবিধার মধ্যে ফেলবে না। কিন্তু ৪০ বছর ধরে চলে আসা ক্ষমতাকেন্দ্রিক সংঘাত ও পারস্পরিক স্বার্থ-সুবিধাজাত সাংঘর্ষিক অবস্থান রাজনীতিকে রুগ্ন দশা থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ও গণআকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী শাসন প্রশাসন পরিচালনা করতে গিয়েই দেশের এই হাল করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এ যুগে কি উন্নত, কি অনুন্নত কোনও দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীই সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরতন্ত্র বিরোধী প্রকৃত সেক্যুলার গণতান্ত্রিক চেতনা ধারণ ও লালন করতে পারে না। একইভাবে বাংলাদেশের কোনও বুর্জোয়া দলই তাদের ঐতিহ্যগত পার্থক্য যতই থাকুক মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা ধারণ করতে পারে না। এরা একে অপরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। আবার গণবিরোধী কুকর্মের দায় একে অপরের উপর চাপাবার চেষ্টা চালায়। সংবিধানকে দেশের সর্বোচ্চ আইন বলা হয়ে থাকে। অথচ সংবিধানের ১৫, ১৭, ১৮, ২০, ২২, ২৫, ৩৫, ১৪৩ ধারা-উপধারা লঙ্ঘন করে দেশ শাসনের কৃতিত্ব শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া, উভয়েরই সমান। সংবিধান নিয়ে তারা বিতর্ক তোলে আইনের প্রতি, জনগণের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ও দায়িত্ববোধ থেকে নয়; তাদের ক্ষমতার স্বার্থে যতটুকু তাকে কাটছাঁট করে বসানো যায় তা নিয়ে। সংবিধানে এ যাবৎ ১৪টি সংশোধনী হয়েছে। প্রায় সবকটিই তাদের সামরিক-বেসামরিক স্বৈরাচারী-স্বেচ্ছাচারী শাসনের আইনি ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে করা হয়েছে অথবা বিকৃত প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ বিতর্কও কম হয়নি। আওয়ামী লিগ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে ধারণ করতে পারেনি। সে কারণে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের রক্তের দাগ না শুকাতেই সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের রক্ষাকবচ জনগণের সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করে গণতন্ত্রবিরোধী কালো আইনের সিংহদ্বার উন্মোচন করেছিল। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের তিন সরকার মিলে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীকে বিচার না করে পাকিস্তানের কাছে সমর্পণ করেছিল এবং বাংলাদেশের শাসকরা যে 'ক্ষমা' করতে জানে তার বলিষ্ঠ ঘোষণা দিয়েছিল। আবার বিএনপি অবৈধ সামরিক ক্ষমতাকে বৈধ করার স্বার্থে পঞ্চম সংশোধনী এনে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধান থেকে উড়িয়ে দিল, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের ১২ অনুচ্ছেদ উপড়ে ফেলে ধর্মীয় প্রতারণাকে হাতিয়ার করল সংবিধানের মাথায় 'বিসমিল্লাহ' বসিয়ে এবং মুখবন্ধে স্বাধীনতা ও মুক্তির যুদ্ধকে অনেকটা ধর্মযুদ্ধের স্পিরিট অনুযায়ী অঙ্গীকারনামা বসিয়ে। বর্তমান মহাজোটের শরিক হোসেন মোহম্মদ এরশাদ অবৈধ সামরিক শাসনকে বৈধ করার জন্য ধর্মীয় প্রতারণার ঢাল হিসাবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের একক দাবিদার আওয়ামী লিগ এগুলোকেই তাদের স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য হিসাবে দাবি করে আসছিল। এখন হাইকোর্ট ৫ম এবং ৭ম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করার পরেও সংবিধানে ধর্মীয় প্রতারণার হাতিয়ার কথিত বিসমিল্লাহ, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার বিধান বহাল রেখেই তাঁরা সংবিধান সংশোধনের বিল সংসদে উত্থাপন করেছেন। তাঁরা জীবিত স্বৈরশাসক এরশাদের বিচারের প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। এতদিন যাঁরা আওয়ামী লিগকে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার ধারক বাহক হিসাবে নানাভাবে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সমর্থন সহযোগিতা করে এসেছিলেন, তাদের সহযাত্রী হয়েছিলেন, তাঁরাও বিপাকে পড়েছেন। কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, আমাদের কথায় কর্ণপাত করলে এবং বোঝার চেষ্টা করলে তাঁরা বুঝতে পারতেন, যত দিন যাবে ততই বুর্জোয়া শক্তিসমূহের কৌশলগত পার্থক্য রেখাও মুছে যেতে থাকবে। কারণ তাদের শ্রেণী উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন, যতই তাদের বাস্তবায়ন কর্মসূচি ও ঐতিহ্যগত পার্থক্য ও বাচনিক ভিন্নতা থাকুক।

তিনি বলেন, আওয়ামী লিগ ও বিএনপি এই দুই প্রধান বুর্জোয়া দলের স্বার্থের সংঘাত এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এতই তীব্র যে, এরা কেউ ক্ষমতা থেকে দূরে থাকতে চায় না। কারণ আপ্ত বাক্যের মতো হলেও আদর্শের যতটুকু রেশ নিয়ে তারা চলছিল তাকেও নিঃশেষ করে দিয়ে ক্ষমতাকেন্দ্রিক সুবিধার বন্ধনে তাদের দলীয় ঐক্য-সংহতি এবং অস্তিত্বকে অনেকটা জড়িয়ে নিয়েছে। তিনি বলেন, দেশের জনগণ তাদের কাছে ভোটে ব্যবহৃত পণ্য, আর দেশি-বিদেশি শোষক লুটেরা গোষ্ঠী, বিশেষ করে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আশীর্বাদ তাদের কাছে অগ্রগণ্য। এদের পারস্পরিক সংঘাত ও অবিশ্বাস-অনাস্থার প্রেক্ষিতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান এসেছিল। বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন তত্ত্বাবধায়কের প্রশ্নে ঘোরতর বিরোধী ছিল। আওয়ামী লিগ মহা হট্টগোল করে তা আদায় করে নিয়েছে। ১৩তম সংশোধনী সংবিধানে এনেছে। এখন আওয়ামী লিগ তত্ত্বাবধায়ক উঠিয়ে দিতে চাইছে। বিএনপি মহাসমারোহে হৈ-হট্টগোলের পথ ধরেছে। আমরা সেজন্য মনে করি, ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে পথ চলা যাবে না। যতক্ষণ পার্লামেন্টকে সক্রিয় করা না যাচ্ছে, আপেক্ষিক অর্থে হলেও সরকারি ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তন করা সমীচীন হবে না। তাতে রাজনৈতিক জটিলতা ও অস্থিরতা অকারণে বাড়ানো হবে। জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক দাবি আন্দোলন চাপা পড়ে যাবে। গণতান্ত্রিক না হলেও যতটুকু নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থা রয়েছে তা আবারও ভেঙে পড়বে।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে সংবিধানের অসম্পূর্ণতা যেমন অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজ এই ছয়টি মৌলিক অধিকারকে সংবিধানের তৃতীয় ভাগ মৌলিক অধিকার চ্যাপ্টারের অন্তর্ভুক্ত করা, আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের বিশেষ সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার স্বার্থে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান, সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, ৭০ ধারা ও জরুরি আইন জারির বিধান বাতিলসহ '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা অক্ষুণ্ণ রেখে সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন করার দাবি জানাচ্ছি। সংবিধান সংশোধনের নামে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ও অতীত অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার ধর্মীয় প্রতারণার হাতিয়ার কথিত বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল করার বিধান বহাল রাখা যাবে না। অন্যথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা বিরোধী শক্তি হিসাবে আওয়ামী লিগকেও ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। আমরা কনোকো ফিলিপস এর সাথে জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির যুদ্ধাপরাধীদের সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করে দলীয় রাজনৈতিক সাংগঠনিক স্বার্থ-সুবিধার ঊর্ধ্বে উঠে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার দাবি জানাচ্ছি। আমরা দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি এবং সাধারণ মানুষের পড়তি আয়ের কথা বিবেচনায় রেখে অবিলম্বে গ্রাম শহরে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে চাল, ডাল, তেল ও চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামরিক বাহিনীর রেটে সরবরাহ করার দাবি জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, আমরা আওয়ামী লিগের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতি পরিবারের একজন সদস্যের যথোপযুক্ত স্থায়ী চাকরি দাবি করছি। ভিজিএফ, ভিজিডি, টিআর, বয়স্ক ভাতা দুঃস্থ ভাতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি বন্ধ করে সকল মানুষকে খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে আনার ও বেঁচে থাকার শর্ত সৃষ্টি করার দাবি জানাচ্ছি।

সর্বশেষ আমরা বলতে চাই, সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল রেখে দ্বি-দলীয় শাসনে দুই প্রধান বুর্জোয়া দলের ক্ষমতাকেন্দ্রিক ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংঘাতের রাজনীতি দেশকে, দেশের মানুষকে সুশাসন ও নিরাপত্তা দেবে না। এদের কাছে দেশের অগ্রগতি-উন্নতি মানেই মুষ্টিমেয় মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি আর সাধারণ মানুষের জীবনমানের অবনতি। গত এক বছরে ৬০০০ কোটিপতি গজিয়েছে বলে বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক স্বীকারোক্তি করেছে। অন্যদিকে, একই সময়ে ৫ লক্ষ মানুষ চরম দারিদ্রসীমার নিচে নেমে গেছে। ৬০ লক্ষাধিক মানুষ সীমিত সামর্থ্যটুকুও হারিয়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে অস্তগামী হয়েছে। তারপরও সরকারের প্রবৃদ্ধির হিসাব হচ্ছে, দুই জন মানুষের একজন যদি ৯৯,৯৯,০০০ টাকা উপার্জন করে আর অন্যজন যদি ১০০০ টাকা মাত্র আয় করে তাহলে গড়ে দু'জনের আয় দাঁড়াবে ৫০ লক্ষ টাকা। এইভাবে ধনীর প্রাচুর্য আর গরিবের দারিদ্র্যকে নিয়ে লুকোচুরি খেলা চলছে। রাষ্ট্রীয় বাজেট ১ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা। অথচ কৃত্রিম বাজার সংকট সৃষ্টি করে ২৫-৩০টি সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী হাতিয়ে নেয় বছরে ৩ থেকে ৪ লক্ষ কোটি টাকা। শেয়ার বাজার থেকে কয়েকজন শেয়ার কারবারি ২০ হাজার কোটির উপর টাকা লোপাট করে নিয়েছে। তার কোনও প্রতিকার নেই। আমাদের গ্যাস সম্পদ কাজে লাগিয়ে গ্যাসের মোট মূল্য ও সংযোজিত মূল্য মিলিয়ে প্রায় ১৫-২০ লক্ষ কোটি টাকা যেখানে আয় হতে পারত, সেখানে প্রতি বছর আমরা ২৫০০ কোটি টাকা জরিমানা গুনছি। সার, বিদ্যুৎ বেশি দামে কিনে ফতুর হচ্ছি।

তিনি বলেন, দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন, স্বাধীনতার পর ৪০ বছর অতিবাহিত হয়েছে, এই অবস্থা কি চলতে থাকবে আরও ৪০ বছর? ২৫০ বছরের সংগ্রামী জাতির এটা বিধিলিপি হতে পারে না। তাই একটা বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োজন। বুর্জোয়া-পাতিবুর্জোয়া বাঙালি-বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী, ধর্মীয় মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি, সামরিক-বেসামরিক আমলা, সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট আমলাতন্ত্র নির্ভর কথিত সুশীল সমাজ, এরা সবাই তাদের গণবিরোধী অবস্থান ও ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে। বামপন্থীদের মধ্যেও কেউ কেউ ক্ষমতার শরিক হতে গিয়ে ব্যর্থতার কলঙ্কের দায়ভার বহন করেছেন। তাই সত্যিকার বিপ্লবী বামগণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী উদারনৈতিক দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তি মিলিতভাবেই বর্তমানের জোট-মহাজোটের দ্বিদলীয় পাল্টাপাল্টির বিকল্প শক্তি হতে পারে এবং দেশ ও দেশের মানুষকে এই মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে আগামী দিনে মুক্তিযুদ্ধের মৌলচেতনা শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বেগবান করতে পারে। আমরা সবাইকে আহ্বান জানাই এবং যে সকল বামশক্তি শাসকগোষ্ঠীর সাথে নানা বিরোধপূর্ণ অবস্থান নিয়ে আছেন, তাঁদের বেরিয়ে এসে, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা বাস্তবায়ন, অপূর্ণতা দূর করে দ্বিতীয় সংশোধনীপূর্ব '৭২-এর মূল সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, তত্ত্বাবধায়ক বিতর্কের অবসান, তেল-গ্যাস-কয়লাসহ প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ রক্ষা, প্রতি পরিবারে একজনকে স্থায়ী চাকরি, শ্রমিকের বাঁচার মতো ন্যূনতম মজুরি ও রেশনিং-এর দাবিতে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের শরিক হয়ে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটানোর জন্য আহ্বান জানাই।

মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের অনুমোদন বাতিলের প্রতিবাদ

মেডিকেল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া কর্তৃক মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের অনুমোদন বাতিলের প্রতিবাদে ঐ কলেজের অধ্যক্ষের কাছে ১৫ জুলাই ডেপুটেশন দেয় মুর্শিদাবাদ জেলা স্বাস্থ্য পরিষেবা সুরক্ষা কমিটি। প্রতিনিধিদলে ছিলেন বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, কমিটির সভাপতি ডাঃ এ হাসান, জেলা যুগ্মসম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম, ডাঃ এম এ সবুর, ডাঃ কায়েমুল ইসলাম, ডাঃ কবিরুল আলম, বিশিষ্ট শিক্ষক এ কে এম বজলুল হক প্রমুখ।

প্রকাশিত হল

মহান স্ট্যালিন

প্রভাস ঘোষ

বোর্ড বাঁধাই - ২৫ টাকা
পেপার ব্যাক - ২০ টাকা

আবার বিক্ষোভে উত্তাল মিশর

মিশরে আবার আছড়ে পড়েছে বিক্ষোভের ঢেউ। এবার বিক্ষোভ অন্তর্বর্তীকালীন শাসক 'সুপ্রিম কাউন্সিল অফ দি আর্মড ফোর্সেস', তথা মিশরের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। দেশে গণতন্ত্র কায়েম করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের দাবিগুলির যথাযথ রূপায়ণের দাবিতে এদের বিরুদ্ধে আবার শুরু হয়েছে আন্দোলন। ১৫ জুলাই বিক্ষোভ মিছিলে কেঁপে উঠেছে রাজধানী কায়রো এবং বন্দর শহর আলেকজান্দ্রিয়া।

গত কয়েক মাস ধরে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার যে দেশগুলি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং চাকরি-খাদ্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের দাবিতে আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে, মিশর তার অন্যতম। সেখানকার তাহরির স্কোয়ারে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ১৮ দিন ধরে জমায়েত হয়ে থেকে স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারকের গুণ্ডাবাহিনীর মোকাবিলা করেছেন মিশরের নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ-যুব সহ আপামর জনতা। জঙ্গি বিমান, মিলিটারি ট্যাঙ্ক — কোনও কিছুই ভয় দেখাতে পারেনি মুক্তিকামী মানুষকে। পুলিশের গুলিতে প্রাণ গেছে অনেকের, তবুও সংগ্রামে পিছু হঠেননি তাঁরা। অবশেষে নিরস্ত্র জনগণের দুর্দমনীয় শক্তি ও তেজের কাছে হার মেনে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক। রাষ্ট্রপতি ভবন ত্যাগ করে পালাতে হয়েছে তাঁকে। সেই সময়, নতুন সরকার নির্বাচিত হওয়ার আগে পর্যন্ত দেশের শাসনভার কাঁধে তুলে নিয়েছিল সামরিকবাহিনী। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পেয়েই সেনাবাহিনীর এই সুপ্রিম কাউন্সিল আন্দোলনকারী জনতার দাবিদাওয়া পূরণে গড়িমসি শুরু করেছে। বিক্ষোভকারীদের হত্যার আদেশ দেওয়া সহ আরও বহু অভিযোগে অভিযুক্ত পদচ্যুত প্রেসিডেন্টের জন-আদালতে বিচারের দাবিটি এখনও পর্যন্ত পূরণ হয়নি, পূরণ হয়নি বেআইনি সম্পদ দখল করা ও বিক্ষোভকারীদের হত্যায় অভিযুক্ত দুই প্রেসিডেন্ট-পুত্রের বিচারের দাবিও। শুধু তাই নয়, যে কোনও উৎপীড়নকারী শাসকের মতোই এই সুপ্রিম কাউন্সিলও ১৫ জুলাই আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। সেই হুমকি উপেক্ষা করেই পথে নেমেছিলেন মিশরের বীর জনগণ। স্লোগান তুলেছিলেন রুটি, স্বাধীনতা আর ন্যায়বিচারের দাবিতে। বলেছিলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারি কর্তারা বিক্ষোভস্থলে এসে আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করছেন, আমরা জায়গা ছেড়ে নড়ব না'।

১১ ফেব্রুয়ারি মুবারকের পদত্যাগের পরেও লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে যাননি মিশরের মানুষ। ঐতিহাসিক তাহরির স্কোয়ারে বেশ কিছুদিন ধরে তাঁরা অবস্থান চালিয়ে গেছেন। দেশে বিদ্যমান ব্যাপক বেকারি ও দারিদ্র্যের অবসান, শ্রমিকদের জন্য স্বীকৃত ন্যূনতম মজুরি, শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার সহ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মতো মৌলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া যে এত সহজে মিটবে না, এ কথা জানতেন তাঁরা। তাই মুবারকের অপসারণের পর সামরিক বাহিনীর হাতে শাসনভার অর্পণ করে মিশরের মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। অল্প কিছুদিনের জন্য ক্ষমতা হাতে পেতেই সেনাবাহিনীর উদ্ধত আচরণ তাই আবার জনগণকে বিক্ষোভে সামিল করেছে। যদিও 'মুসলিম ব্রাদারহুড' নামের যে সংগঠনটির নাম মিশরের ফেব্রুয়ারি আন্দোলনে সামনে উঠে এসেছিল, তারা কিন্তু এবারের বিক্ষোভে সামিল হয়নি। এ বছরের শেষে সে দেশে নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মৌলবাদী এই সংগঠনটির চোখ এখন ঐ নির্বাচনের দিকে। যেহেতু মিশরের সামরিক বাহিনীই নির্বাচনের তারিখ এবং নিয়মকানুন নির্ধারণ করবে, তাই ব্রাদারহুড তাদের সঙ্গে এখন সংঘাতে যেতে চাইছে না। কিন্তু অন্যায় সহ্য করতে রাজি নন মিশরের সংগ্রামী জনতা। নতুন করে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। ১৫ জুলাইয়ের এক সপ্তাহ আগে থেকেই আবার তাঁরা জড়ো হতে শুরু করেছিলেন কায়রোর ঐতিহাসিক তাহরির স্কোয়ারে। আচমকা পুলিশি হামলা রুখতে স্কোয়ার ঘিরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল, গেটে গেটে মোতায়েন ছিলেন স্বেচ্ছাসেবকরা। এ দিন দেশের বৃহত্তম দুই শহরে হাজার হাজার মানুষ মিছিল করেন, মুখে তাঁদের স্লোগান — 'পুলিশ তুমি ঠগবাজ!' পুলিশের হেডকোয়ার্টার্সের ছাদে চড়ে পুলিশের পতাকা ছিঁড়ে ফেলে তাঁরা টাঙিয়ে দিয়েছেন মিশরের পতাকা, দেওয়ালে দেওয়ালে এঁকেছেন পুলিশবিরোধী অসংখ্য কার্টুন, পুলিশ মন্ত্রকের প্রতীকের উপর রঙ দিয়ে লিখে দিয়েছেন — 'অত্যাচার মন্ত্রক'। এদিনের মিছিলের মুখ্য দাবি ছিল, মুবারক জমানার সমস্ত জনবিরোধী বিষয়গুলি থেকে দেশের শাসনব্যবস্থাকে মুক্ত করা।

ফেব্রুয়ারি মাসে মিশরের দৃঢ়চিত্ত জনগণকে তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। বলেছিল, একদিকে ক্ষমতাসীন সরকারের নির্মম স্বৈরশাসনের অবসান, অন্যদিকে জনজীবনের তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সমাধানের দাবিতে আরব দুনিয়া ও আফ্রিকার একটি অংশে যেভাবে আন্দোলন চলছে, তা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে স্বৈরশাসকদের মাধ্যমে কায়েম হওয়া সাম্রাজ্যবাদের বজ্রমুষ্ঠি অবশ্যই কিছুটা শিথিল হবে, কিছুটা হলেও বইবে গণতন্ত্রের বাতাস। কিন্তু যে সমস্যায় জর্জরিত হয়ে এই দেশগুলির মানুষ রাস্তায় নেমেছেন, সেই তীব্র দারিদ্র, বেকারত্ব সহ অন্যান্য অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান শুধু স্বৈরাচারী শাসকদের উচ্ছেদ করার দ্বারা সম্ভব হবে না। এই সংকটগুলির মূল উৎস যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, তাকে উচ্ছেদ না করতে পারলে জনজীবনের এইসব সংকট দূর হবে না।

(সূত্র ঃ দি হিন্দু, ১৩-৯-১১ এবং, এপি)

রেল নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল

তিনের পাতার পর

৩২,৬৯৪ টি লেভেল ক্রসিংয়ের মধ্যে প্রহরী নেই ১৪,৪৫৩টির। প্রহরীহীন ক্রসিংয়ের জন্য দেশে ১১টি রেল দুর্ঘটনা হয়েছে। অতি সম্প্রতি রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রসিংয়ে একটি বাসকে ধাক্কা দেয় মথুরা-ছাপরা এক্সপ্রেস। মারা যান ৩৮ জন বাসযাত্রী। এর জন্য দায়ী কে? রেলে শূন্য পদ পূরণ না হওয়ার জন্য নিয়ম করে ট্র্যাক সংরক্ষণ, পয়েন্ট, সেতু ও বৈদ্যুতিক লাইন পরীক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। এমনকী ট্রেনগুলিকে ঠিকমতো পরীক্ষাও করা হচ্ছে না কর্মীর অভাবে। নিয়ম অনুযায়ী ট্রেন শেষ স্টেশনে পৌঁছানোর পর তার ইঞ্জিন, ব্রেক সহ সুরক্ষা ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে ফিট সার্টিফিকেট দিতে হয়। সেটি চালককে দিলে তবে আবার ট্রেন ফিরতি পথে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু রেকের (ইঞ্জিন ছাড়া বাকি অংশ) অভাবে এই পরীক্ষারও সময় পাওয়া যায় না। প্রচুর নতুন ট্রেন চালু হয়েছে অথচ প্রয়োজনীয় সংখ্যায় রেক নেই। ডাউন ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে রুটিন চেক আপ না করেই আপ ট্রেন ছেড়ে দেয়। নিয়মমতো রেক, ইঞ্জিনকে বিশ্রাম দেওয়া হয় না, পরীক্ষাও হয় না। ফলে রেল দুর্ঘটনা নিয়মিত হারে বাড়ছে, তার ভয়াবহতাও বাড়ছে।

এরপর আছে চালকের অভাবে অনভিজ্ঞ চালককে দিয়ে ট্রেন চালানো এবং চালকদের উপর বাড়তি ডিউটির বোঝা। রেলের ৭০০০ লোকো পাইলটের পদ খালি। যাত্রীদের চাপ কমাতে প্রতি বাজেটেই নতুন নতুন ট্রেন চালু করা হচ্ছে। কিন্তু সেই তুলনায় ড্রাইভারের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, কর্মীর অভাব মেটাতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না পাওয়া অনভিজ্ঞ চালকদের হাতে দুরন্ত গতির ট্রেন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। মালগাড়ি এবং প্যাসেঞ্জার ট্রেনের চালকদেরও দ্রুত গতির মেল, এক্সপ্রেস ট্রেন চালাতে দেওয়া হচ্ছে। ফলে যাত্রী সুরক্ষার কথা বলা হচ্ছে অনেক, কিন্তু বাস্তবে যাত্রীরা হাতে প্রাণ নিয়ে রেলযাত্রা করছেন। দূরপাল্লার দ্রুতগামী ট্রেনগুলির ইঞ্জিনের আধুনিকীকরণ করা হলেও উপযুক্ত মানের এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যার ট্রেনচালক রেল দপ্তরের হাতে নেই। সেই শূন্য পদ পূরণ করার পরিকল্পনাও রেল দপ্তরের নেই। দেখা যাচ্ছে যে, চালকদের সিংহভাগই ঐসব অত্যাধুনিক দ্রুতগতির মেল ড্রাইভারের যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ফলে মেল, এক্সপ্রেস ট্রেন চালানোর মতো দক্ষ চালক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার চালক যাঁরা আছেন তাঁদের গড়ে প্রায় ১৪-১৬ ঘন্টা একটানা ডিউটি করতে হয়। অথচ রেলের নিয়ম অনুযায়ী টানা ৮ ঘন্টা ট্রেন চালানোর পর অন্তত ৫ ঘন্টা বিশ্রাম পাওয়ার কথা চালকদের। আর ৬ দিন এভাবে কাজ করার পর চালকের ৩২ ঘন্টা টানা বিশ্রাম পাওয়ার কথা। বর্তমানে প্রায় সব চালকের বক্তব্য যে ৩২ ঘন্টা বিশ্রামের কথা তাঁরা ভুলেই গেছেন। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লেও পরিবর্ত চালক না থাকায় জোর করে তাঁদের ডিউটি করানো হয়, বাড়তি ডিউটিও করানো হয়। চালকরা বলছেন, পর্যাপ্ত বিশ্রাম না নিয়ে দিনের পর দিন এভাবে কাজ করতে করতে তাঁরা শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্লান্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছেন। অনেকেই চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবছেন। আর ট্রেন চালানোর মতো অত্যন্ত মনসংযোগের কাজে বাড়তি ডিউটির বোঝায় চালকদের সতর্কতাবোধ শিথিল হচ্ছে। যাত্রী নিরাপত্তার দিক থেকে এর ফল হচ্ছে অত্যন্ত মারাত্মক। চালকরা অনেকেই এই চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মনোবিদের কাছে যাচ্ছেন। রেল দপ্তরের এক পদস্থ অফিসার জানাচ্ছেন যে, ১৯৭৪ সালে রেলের সবকটি জোন মিলিয়ে চালক ছিলেন ৯৬ হাজার। ২০১১ সালে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৫৪ হাজারে। অথচ ট্রেনের সংখ্যা অন্তত দ্বিগুণ হয়েছে। ফলে এই অমানুষিক বাড়তি চাপে চালকরা দিশেহারা। অন্যদিকে যাত্রী সুরক্ষা একেবারে তলানিতে।

এছাড়াও আছে রেলে নাশকতার সমস্যা। দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও মানুষকে নাশকতাবাদীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আসামের রেল দুর্ঘটনার পর রেলের অধিকর্তারা জানাচ্ছেন, ঐ ডিভিশনে নাশকতার কোনও তথ্য গোয়েন্দারা রেলকে জানায়নি বলে রঙ্গিয়া ডিভিশনে এই ধরনের কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই দূরপাল্লার ট্রেনে। নেই রাতের এক্সপ্রেসে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রক্ষীও। রঙ্গিয়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এ মালহোত্রা বলেছেন, 'নিরাপত্তা সংস্থাগুলি না বলায় আমরা রাজধানী ছাড়া অন্য কোনও ট্রেনের আগে লাইট ইঞ্জিন চালাই না।' পুলিশ কর্মীর অভাবে রাতের ট্রেনে নিরাপত্তা দেওয়া যাচ্ছে না বলে অসম পুলিশের এডিজি (আইন শৃঙ্খলা) জানান। অথচ 'দেশের নিরাপত্তার' জন্য লক্ষ কোটি টাকা খরচ করার কথা সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের বক্তৃতায় অনবরতই শোনা যায়। 'দেশ' মানে যদি দেশের জনগণ হয়, তাহলে তাদের নিরাপত্তা কোথায়? আসলে সরকারি ক্ষমতায় আসীন মন্ত্রী এবং প্রশাসনের বড়কর্তাদের কাছে দেশের সাধারণ মানুষের প্রাণের কোনও মূল্যই নেই। তাই বাড়ি থেকে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়া যে মানুষটির ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত শবদেহটি ফিরে এল তার স্বজনদের কাছে, তার বীভৎস চেহারা দেখে শিউরে ওঠেন না দেশের এইসব শাসকরা, বিনা দোষে নিহত এই মানুষের শোকে উদ্বেল পরিবার-পরিজনের হাহাকার তাঁদের কাঁদায় না। সে কারণেই রেলের যে অব্যবস্থাগুলি দূর করা নিতান্তই সহজ এবং যা করলে অসংখ্য রেলযাত্রীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়, সেগুলি দূর করে সুষ্ঠুভাবে রেল দপ্তর পরিচালনা করায় তাঁদের এত গাফিলতি। মৃত ও আহতদের পরিবার পিছু ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছু অর্থ বরাদ্দ করেই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেন এঁরা।

এস এস সি পরীক্ষায় নয়া নিয়মের প্রতিবাদে স্নাতকদের মহাকরণ অভিযান

এস এস সি পরীক্ষায় বসার জন্য স্নাতক সাধারণ ছাত্রদের ৫০ শতাংশ ও এসসি-এসটি ছাত্রদের ৪৫ শতাংশ নম্বর আবশ্যিক এবং বি এড ডিগ্রি বাধ্যতামূলক করার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এস এস সি পরীক্ষার্থী সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ১৮ জুলাই বিক্ষোভ দেখালেন ছাত্রছাত্রীরা।

ঐদিন স্নাতক ছাত্রছাত্রীরা কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হন। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন কমিটির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক দীপক পাত্র, সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী। এরপর মেট্রো চ্যানেল অভিমুখে মিছিল শুরু হয়। মিছিল বৌবাজার ক্রসিং পৌঁছেতেই পুলিশবাহিনী মিছিলের গতিরোধ করার চেষ্টা করে। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পৌঁছলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মিছিল আটকে দেয়। এতে পরীক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ঐখানেই বিক্ষোভ দেখান। এরপর কমিটির তিনজন প্রতিনিধি দীপক পাত্র, অঞ্জন মুখার্জী ও প্রবীর রায় মুখ্যমন্ত্রীর সচিবের কাছে ডেপুটেশন দিতে গেলে তা নিয়েও চলে পুলিশি টালবাহানা। শেষপর্যন্ত প্রতিনিধিরা সচিবের কাছে ডেপুটেশন দেন। ডেপুটেশন শেষে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সরকারি কালা সার্কুলার পোড়ানো হয়।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

স্কুলে ধর্মগ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য করা গণতান্ত্রিক শিক্ষার পরিপন্থী — এ আই ডি এস ও

এ আই ডি এস ও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী ২২ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, “জাতীয় স্তরের সংবাদমাধ্যমগুলির রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে, বিজেপিশাসিত মধ্যপ্রদেশ ও কর্নাটক সরকার ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল পাঠ্যসূচিতে শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা পড়ানোর প্রস্তাব করেছে। আমরা এই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করছি। এই প্রস্তাব আমাদের দেশের নবজাগরণের মহান মনীষীদের প্রদর্শিত ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার পরিপন্থী। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ধারণা অনুযায়ী ধর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় হওয়া উচিত এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পাঠক্রম সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা উচিত। গণতান্ত্রিক শিক্ষার ধারণা অনুযায়ী শিক্ষক, অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতীদের দ্বারাই বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় নির্ধারিত হওয়া উচিত এবং এই বিষয়ে কোনওভাবেই সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। যেখানেই বিজেপি সরকারি ক্ষমতায় এসেছে সেখানেই তারা তাদের হিন্দুত্ব কর্মসূচিকে শিক্ষার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছে। আমাদের দেশে কুসংস্কার যখন সমাজে আজও প্রবল এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলি জাত-পাত-ধর্মের এই বিশ্বাসকে প্ররোচনা দিয়ে ভোটের স্বার্থে ও অন্যান্য সুবিধার লোভে জনগণের ঐক্যকে বিঘ্নিত করছে, তখন এই ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত মারাত্মক। আমরা এই প্রস্তাব অবিলম্বে বাতিলের দাবি জানাচ্ছি এবং ঐ সমস্ত রাজ্যের শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, ছাত্র ও জনসাধারণকে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে ও স্কুল পাঠসূচিতে নবজাগরণের যুগের গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধবাহী সাহিত্য এবং রচনা পড়ানোর দাবি জানাতে আহ্বান জানাচ্ছি।”

ওড়িশায় পস্কোবিরোধী আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি)

২৩ জুলাই ওড়িশার জগৎসিংপুরে পসকো বিরোধী জমিরক্ষার আন্দোলনে যুক্ত গ্রামবাসীদের মাঝে এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল

বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে ত্রিপুরায় বিক্ষোভ

ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড-এর আগরতলা কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে ১৯ জুলাই বিদ্যুৎ মাশুল কমানো সহ বিভিন্ন দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে এক বিক্ষোভ ধর্না অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন সিপিএম সরকারের মতোই ত্রিপুরার সিপিএম সরকারও বিদ্যুৎ দপ্তরকে কর্পোরেশনে পরিণত করে বেসরকারিকরণের পথ সুগম করে দেয়। যার ফলে কর্পোরেশন বার বার বিভিন্ন অজুহাতে বিদ্যুৎ মাশুল বাড়িয়ে কর ও মূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত মানুষের উপর আরও বোঝা চাপিয়ে চলেছে। প্রতিবাদে দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক এবং সদস্য কমরেডস শিবানী দাস, সুব্রত চক্রবর্তী ও বাবুল বণিক বিদ্যুৎ কর্পোরেশনের সি এম ডি এ-র নিকট আট দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি জমা দেন। তাতে দাবি করা হয় — এফ পি পি সি এ-র ৬০ শতাংশ বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার করতে হবে। ডোমেস্টিক গ্রাহকদের স্ল্যাব অনুযায়ী নির্ধারিত দামের সুবিধা দিতে হবে। ফিক্সড চার্জ ও মিটার রেন্ট তুলে দিতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে প্রভৃতি।

শ্রীকাকুলামেও জমি রক্ষার লড়াই

সিঙ্গুরের চাষিদের মতোই জমিরক্ষার লড়াই চালাচ্ছেন অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামের চাষি এবং মৎস্যজীবীরা। কৃষি ও পরিবেশ ধ্বংস করে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের নামে ৭৫০ একর জমি নিতে চায় নাগার্জুন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি। এর বিরুদ্ধেই চাষিদের সংগঠিত লড়াই।

শ্রীকাকুলাম সংলগ্ন বারোয়া পেয়টা জলাভূমি প্রকৃতির এক সৌন্দর্যময় সৃষ্টি। এই জলাভূমি ৩২টি গ্রামের খাবার জলের উৎসই শুধু নয়, কয়েক হাজার কৃষক ও খেতমজুরের জীবিকা নির্ভর করে এই ভূমির উপর। এ ছাড়া কয়েকশো মেষপালকের জীবন-জীবিকা এবং স্থানীয় গোলাগান্ধি গ্রামের ৪০০ জেলে পরিবারের জীবিকারও উৎস। এই ভূমির ৭২৫ একর জায়গায় বছরে দু'বার ধান চাষ হয়, যা ওখানকার প্রধান ফসল। বেশ কিছু জমিতে বিভিন্ন ধরনের সবজি হয়। ২৫ একর জায়গায় রয়েছে নানা জাতের গুল্মবৃক্ষের একটি জঙ্গল, যার স্থানীয় নাম ‘পামুলা মেটা’। এখানে ১১৮ রকমের পরিযায়ী এবং কিছু স্থায়ী বিরল প্রজাতির পাখি আছে, রয়েছে অজগর সহ বিভিন্ন বিষধর ও জলজ সাপ, বন্য শূকর, শৃগাল, ভল্লুক প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় প্রাণী। পরিবেশ ও দূষণ প্রতিরোধক এখানকার বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করে, কৃষক-খেতমজুর, মেষপালক, জেলেদের জীবিকার সংস্থান নষ্ট করে ‘নাগার্জুন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি’ (এন সি সি) এখানে কোল বেসিন থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট করতে চায়। এই উদ্দেশ্য তারা ২০০৯-এর ১৮ আগস্ট জলাভূমি সংলগ্ন গোলাগান্ধি গ্রামে একটি জনশুনানির আয়োজন করে। সেখানে ঐ গ্রামের ৯০ শতাংশ মানুষ থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট করার বিরুদ্ধে মতামত দেন। কিন্তু এন সি সি জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করেই ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের সাহায্যে জমি দখলের প্রচেষ্টা চালায়।

প্রতিবাদী কৃষক-মৎস্যজীবীদের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কমরেড অমিতা বাগ

স্থানীয় জনগণ আন্দোলন পরিচালনার জন্য সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ধাঁচে ‘পরিয়াভরনা পরিরক্ষা সংগম’ (পিপিএস) নামে গণকমিটি গড়ে তোলেন। মিটিং-মিছিল-প্রশাসনিক স্তরে ডেপুটেশন-বনধ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। ৪ ডিসেম্বর থেকে রিলে অনশন শুরু হয়ে এখনও চলছে। এন সি সি-র ম্যানেজমেন্ট ২০১০-এর ৩০ এপ্রিল তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের কাজ শুরু করতে গেলে এলাকার মানুষ বাধা দেয়। ১৪ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের কংগ্রেস সরকার ৩০০০ পুলিশ দিয়ে এন কোম্পানির জন্য জমি দখল করতে গেলে জনতার সঙ্গে পুলিশের লড়াই হয়, এক হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হন এবং দু'জন কৃষক পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে রক্তে ভেজা বারোয়া পেয়টা জলাভূমির মাটিতে একটি শহিদ স্তম্ভ স্থাপন করে পিপিএস। শহিদ স্মরণে গত ১৪ জুলাই ঐ শহিদ স্তম্ভ উন্মোচন করা হয়। এই উপলক্ষে একটি জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়। দশ হাজারের বেশি স্থানীয় মানুষ এই সভায় যোগ দেন। বক্তব্য রাখেন পিপিএস সভাপতি ডাঃ কৃষ্ণমূর্তি, যুগ্ম সম্পাদক টি রামারাও, অন্ধ্রপ্রদেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রখ্যাত অভিনেতা আর নারায়ণ মূর্তি প্রমুখ। এই সভায় সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির অন্যতম সংগঠক এবং এস ইউ সি আই (সি) দলের সদস্য কমরেড অমিতা বাগ আমন্ত্রিত হন। আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে ও সিঙ্গুরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন, সঠিক পথ নির্ধারণ করে গণআন্দোলন পরিচালনা করতে পারলে আন্দোলনের জয় হবেই। তেভাগা, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নর্মদা এই শিক্ষাই দেয়। আজ আপনারা যে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করলেন তা সারা দেশে মানুষের কাছে গণআন্দোলনের প্রেরণাদায়ক এক প্রতীক, যা বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে গণআন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহস জোগাবে, প্রেরণা দেবে।

রেললাইনের দাবিতে আসামে আইন অমান্য

শিলচর-লামডিং ব্রডগেজ রূপায়ণের দাবিতে ৫ জুলাই শিলচরে গণ আইন অমান্য

কমরেড
শিবদাস ঘোষের
১৯৭৫ সালের
২৪ এপ্রিলের ভাষণ
বই আকারে
প্রকাশিত হচ্ছে

মহারাষ্ট্রে শ্রমিকদের দাবি আদায়

কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত এন আর সি সি সংস্থায় ঠিকাদার কোম্পানি মেসার্স ন্যাশনাল প্রোটেকটিভ সিকিউরিটি সার্ভিসে নিযুক্ত ঠিকাদার শ্রমিকরা দীর্ঘদিন যাবত কর্মরত থাকলেও সরকার অনুমোদিত নিম্নতম মজুরি, পরিচয়পত্র, বেতনের স্লিপ, পিএফ, ইএসআই প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে ও নিজেদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য তাঁরা এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে সংগঠন গড়ে তোলেন। ২ জুলাই নবগঠিত ‘রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান কেন্দ্র ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে’র নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়। এজন্য কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ছাঁটাই করলে শ্রমিকরা ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের চাপে শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়া সহ অন্যান্য দাবিগুলি নিয়ে মীমাংসায় আসতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।